নটী নবনীতা

নবনীতা দেবসেন

কুণ্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো মতুন করে স্ক্যান বা করে পুরনোগুলো বা এডিট করে মতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা বাংলা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা মতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhojit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

নটী নবনীতা

নবনীতা দেব সেন

শ্রীসত্যজিৎ রায়
শ্রীমতী বিজয়া রায়
করকমলেষু

সূচী

১

গাছ-পাথরের বয়েস ... ৩
প্রথম প্রত্যয় ... ২২
নটী নবনীতা অথবা আমার অভিনেত্রী জীবন ... ৫৪
আলাপ ... ৬৮

২

ছন্নপ্রশ্ন : ছিন্নচিন্তা ... ৭৫
ভালো লেখকরা কেন খারাপ লেখেন : রোগনির্ণয় ও রোগমুক্তির প্রস্তাব ... ৮৭
বই মেলা : মেলা বই ... ৯৭
গল্পের খোঁজে ... ১০০
পাই-রো-অমিক্রন-ডেলটা-ওমেগা-সিগমা-মিউ-ইয়টা-টাউ-রো-অমিক্রন ওরফে ফাই-এপসিলন-লামডা-উপসিলন-ডেলটা-আলফা ভের্সাস আমরা ... ১০৮

৩

আজি দখিন দুয়ার খোলা ১২১
মনে আর মুখে ... ১৩৭
নাম-ডাক ... ১৪৬
ছুটি ... ১৫০

এ লেখাগুলির বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের পাতায়, ১৯৭৩—১৯৮২র মধ্যে। নানারঙের টুকরোগুলি একসঙ্গে বুনে দিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স আমার কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন।

নবনীতা দেব সেন

ئ

গাছ-পাথরের বয়েস

খাস কলকাতার মেয়ে আমি—চিরকেলে শহুরে। যে বাড়িটায় এখন আছি, সেই বাড়িতেই আমার জন্ম। ছেলেবেলার খেলনাপাতি এমন কি হাসিখুশি হ-য-ব-র-ল-টা পর্যন্ত এখান থেকে সেখান থেকে হরদম বেরিয়ে পড়ে। ঐ যে সবুজ পাথরের চৌকাঠে বসে ছোট্ট পাথরের শিলে মাটি গুঁড়িয়ে বাটনা বাটছে আমার ছোটো মেয়ে, ঐ চৌকাঠে বসে ঐ শিলটা নিয়েই মাটির ঢেলা বাটতুম আমিও। সেদিন ছাদের ঘর থেকে ফেলে দেওয়া হলো পেট-ফাটা লাল মখমলের মস্তোবড়ো হাতীটা। মখমলের হাতীর পেটে যে থাকে কাঠের গুঁড়ো বোঝাই—তা আমার এতদিনে জানা হলো। গ্যারাজের টিনের চালে এখনো পড়ে আছে প্যাডেল-করা মোটর গাড়িটার মর্চে-ধরা কঙ্কাল।

যে-বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে আমি দুপুরবেলায় ডাকতুম 'এই যে, ও ম্যাগ্নোলিয়া! ও আইসক্রীমওলা!' ঠিক সেখানে দাঁড়িয়েই তেমনিই লোভের ভরে ঝুঁকে পড়ে আমার মেয়ে ডাকে, 'এই যে, ও কোয়লিটী! এই আইসক্রীমওলা!' আমি মার পাশে বসে দেখি। মাও দেখেন। হাসেন।

কম মানুষের জীবনেই এমন সুযোগ হয়। আজন্ম একই বসত-বাড়িতে বাস। কিন্তু বসত থাকলেই কি বাড়িটা থাকে? এই বাসা কি সেই বাসাটাই আছে? নাম এক ঠিকানা এক, কিন্তু বাড়িটা এক

নয়! তার উত্তরের থাম বেয়ে তিনতলা পর্যন্ত একটা মালতীলতা উঠেছিল। একটা চামেলীর লতা ছিল দোতলা গোল বারান্দার টবে —এখন যেটা শান বাঁধানো উঠোন, সেখানে ছিল একটা অতিপ্রসবিনী ডবল-রক্তকরবীর ঝাড়। এখন যেখানে গ্যারাজ, সেখানে ছিল মানকচুর বন, টগরফুলের ঝাড়, আর দুটো নিষ্ফলা পেঁপে গাছ। এসবের একটিও এখন নেই, চাঁচাছোলা দাড়িগোঁফ কামানো মুখের মতো বাড়ি। এ বাড়ির অনেক কিছুই পালটেছে। তার দোর জানলা, নল-চৌবাচ্চায় ঢের অদলবদল হয়েছে। পড়ার ঘরের বড় জানলার একটা আস্ত কপাট উড়িয়ে নিল এক বছর কালবোশেখীর ঝড়। আমরা অবাক হয়ে ভাবলাম—'বাপরে! কী কাণ্ড!' তার পরের বছরে ঘূর্ণিঝড়ে চারতলার পুরো চিলেকোঠাটাই উড়িয়ে নিয়ে গেল। এ্যাসবেস্টসের ছাদ, দেওয়াল সবসুদ্ধ। আমরা অবাক হয়ে ছিটকিনি খুলে দেখি—ওমা! ঘর কই? এ যে সুন্দর এক পশ্চিমের বারান্দা। সেই বারান্দায় একহাঁটু বৃষ্টির জলের মধ্যে বসে আছেন গণ্যমান্য সব বাক্সপ্যাঁটরা, যাতে বাবা-মার জমানো পুরোনো চিঠিপত্তর, বই-কাগজ, জামাকাপড়, আর আমার ঐসব হাতি-ফাতি, খেলনাপাতি। অন্নপ্রাশনের আলতা মাখামাখি ক্ষুদে বেনারসীটাও পর্যন্ত ছিল ও-ঘরে, একটা ভিজে টুসটুসে কট্‌কী গামছার পুঁটলিতে। অনেক কিছুই ফেলে দেওয়া হয়েছে, তবু অনেক কিছু থেকে গেছে। আবার নেই-দেয়ালে দেয়াল হয়েছে, নেই-ছাদে ছাদ বসেছে, বারান্দা আবার চিলকুঠরি হয়েছে। কোথাও বারান্দা ছিল, দিনে দিনে ঘর হয়ে গেছে, কোথাও বারান্দা ছিল না, একচিলতে নতুন বারান্দা বেরিয়েছে—মোট কথা সে বাড়ি আর সে বাড়িটি নেই। তার যেমন দোর কপাট এদিক ওদিক হয়েছে তেমনি বদলেছেন বাড়ির মানুষজনেরাও। এ

বাড়িতে একজন প্রকাণ্ড পুরুষমানুষ ছিলেন যাঁর ভালোবাসা দিয়ে এই 'ভাল-বাসা' গড়া, তাঁর দরাজ গলার হাঁকেডাকে বাড়ি গমগম করতো। ভোর থেকে রাত্তির অবধি মানুষজন আসতো কেবল তাঁর ভালোবাসার টানে। সেই মানুষটাই নেই। অথচ বাড়িটা রয়েছে। মড়মড় করে ভেঙ্গে তো পড়ে যায়নি সেই এক ৫ই বৈশাখের বিকেলবেলায়? আমার যে মোটাসোটা টকটকে সাদা রঙের মা, লালপাড় শাড়ির আঁচলে চাবি, চুড়িশাঁখাপরা হাতে দুধের গেলাস, কপালময় ঘামে-সিঁদুরে আর কাঁকড়াকালো খুচরো চুলে লেপ্টে থাকতো যাঁর, হাঁপাতে হাঁপাতে আমার পিছনে দৌড়ুতেন—সেই মা-ই বা এখন কোথায়? হ্যাঁ, মা আছেন—ধবধবে চুলে, ধবধবে সিঁথি, ধবধবে থানপাড়ে, শাদা ফ্যাকাশে মা এখন সারাদিন শুয়ে থাকেন বিছানায়। আঁচলের চাবি খুলে রেখেছেন। এই মা আমার সেই মা নন।

আর যে-মেয়েটা এ বাড়িতে জন্মেছিল, লাল মখমলের হাতী নিয়ে খেলা করত? সে গেল কোথায়? এই যে ভদ্রমহিলাটি এইমাত্র কর্মস্থল থেকে ফিরলেন, চা-চা করে চাতকীয় চেঁচামেচি করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই পাখা খুলে দিয়ে ব্যর্থমনোরথ হলেন, লোডশেডিংয়ের জন্যে সরকারের পিতৃপিতামহকে স্মরণ করতে করতে বিপুল হাঁপাচ্ছেন, আর আপাতত থলি থেকে একটা সুগোল তরমুজ বের করে টেবিলে রাখছেন—ইনিই কি সেই মেয়ে?

অথচ আশ্চর্য এই যে, মায়ের আলমারিতে তার দুধ খাবার সেই রূপোর গেলাসটা পর্যন্ত আছে, সরপোশের ওপরে 'নবনীতা' লেখা। কিন্তু সেই মাও নেই, সেই মেয়েও নেই, তবু গেলাসটা একই-রকম রয়ে গেছে। বাড়িটাও এক নেই, পাড়াটাও এক নেই।

ঠিকানাটা তবু একই। জীবনের মজাটা এখানেই।

আমি যে বাড়িতে বড়ো হয়েছি আমার মেয়েরাও বড়ো হচ্ছে সেই বাড়িতেই—অন্তত দেখলে তাই মনে হবে। কিন্তু আসলে তা নয়। আমি যে-পাড়ায় বড় হয়েছি আমার মেয়েরা কিন্তু সেই পাড়ায় বেড়ে উঠছে না। সেই পাড়াটাই আর নেই। তার চেহারা চরিত্র দুই-ই বদলে গেছে। ঠিক যেন আমার মায়ের মতো। সে লালপাড় শাড়ির শোভা নেই, আলতা-সিঁদুরের লাবণ্য নেই, শাঁখা-চুড়ির রুনুঝুনু বাজনা নেই, চাবির গোছার কর্তৃত্ব নেই। পাড়াটাও যেন সব শ্রী ঘুচিয়ে থান পরে বসে আছে।

না, এমন পাড়ার কোলে আমি বেড়ে উঠিনি। সে ছিল এক অন্য পল্লী। তাতে লক্ষ্মীশ্রী উপচে পড়তো। বাড়ির খোদ মালিকরাই তখন ছিলেন বাড়ির বাসিন্দে, কত্তায়-কত্তায়, গিন্নিতে-গিন্নিতে, বাড়িতে-বাড়িতে ভাব ছিল। এখন প্রত্যেক বাড়িতে ভাড়াটেরা এসেছেন। তাঁরা যান-আসেন, আসেন-যান। পুরোনো কত্তামশাইরা সকলেই স্বর্গে। আছে সন্তানরা, ছেলের বউ, নাতি-নাতনীরা। কেই বা কাকে চেনে। কেই বা কাকে টানে। কে কার ঘরে যায় আসে। সুখে দুঃখে রা কাড়ে না কেউ। যে যার সে তার। পাড়া তো নয়, শূন্য-বুক অচিনপুরী। তদুপরি উঠেছে হাই-রাইজ এ্যাপার্টমেণ্টস এবং পাড়াটি আর ভেতো-বাঙ্গালীমার্কা নেই। এ পাড়ার এখন যাকে বলে সর্বভারতীয় চরিত্র। অতি ধনী মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবী আর অতিভদ্র দক্ষিণী বাসিন্দায় পাড়া যেন বেপাড়ার মতো রহস্যময়।

আমাদের ছেলেবেলায় এবাড়ি ওবাড়ির ফাঁকে ফাঁকে কতো মাঠ ছিল, আমরা পাড়ার বাচ্চারা মাঠ বদলে বদলে খেলতুম। এখন সব মাঠেই বাড়ি। বাড়ি। বাড়ি। পাড়া নেই। পাড়ার ছেলে, পাড়ার

মেয়ে, পাড়ার কত্তা, পাড়ার গিন্নি—এ ব্যাপারটাই নেই। যখন পাড়া ছিল, তখন আমরা পাড়ার ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ভোর রাত্তিরে ফুলচুরি করতে বেরুতুম পেতলের সাজি নিয়ে। বিশেষত এই শিব-পুজোর এক মাস তো বটেই। বাড়ি বাড়ি সত্যনারায়ণ হতো, আমরা পাঁচালী শুনে, সিন্নি খেয়ে কোঁচড় ভর্তি হরির লুঠ কুড়িয়ে বাড়ি আসতুম। আর বেস্পতিবার তো খুব মজা। প্রত্যেক বাড়ি ঘুরে ঘুরে লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খাওয়া। আমাদের পাড়াতে সন্ধ্যেবেলা শাঁখ বেজে উঠতো, বাড়ি বাড়ি সন্ধ্যে দেওয়া হতো। ধুনো দেওয়া হতো ঘরে ঘরে, উঠোনে, নইলে ছাদে তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া হতো! শাঁখ বেজে ওঠা মানেই খেলা শেষ। বাড়ি ফিরে পড়তে বসার সংকেত। কার্তিক মাসে প্রত্যেক বাড়ির মাথায় বাঁশের ডগাতে আকাশদীপ জ্বলতো। অথচ এ অঞ্চলটা কোনদিনই গ্রাম্য নয়। দক্ষিণে সাদার্ন এভিনিউ, লেক—উত্তরে রাসবিহারীর ট্রাম লাইন, পুবদিকে গড়িয়াহাট জংশন, পশ্চিমে লেক মার্কেট।—খবরের কাগজে বলে এ পাড়ায় লোড শেডিং নেই। (আসলে আছে!)—এহেন জরুরী অঞ্চল! কিন্তু ওপরে যেসব কথা লিখেছি, আমার মেয়েরা পড়লে ভাববে বুঝি অপরূপ কোন রূপকথার কাহিনী, অরুণ-বরুণ-কিরণমালাদের গল্প। বাড়ির ছাদে আকাশদীপ? সে কি কথা? ছাদে তো ঝলমলায় এরিয়েল—টেলিভিশনের। আর সন্ধ্যেবেলায় শাঁখ? দূর, সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি বাড়ি যা বেজে ওঠে (যদি কারেন্ট থাকে), সে হলো টিভি! ওদের কোন 'পাড়া' নেই। ওদের 'পাড়ার মাথা' নেই। আমাদের এইসব ছিল।

আমাদের পাড়াতে এক কবিরাজমশাই থাকতেন। তাঁর এ্যাসিস্ট্যান্ট রোজ কত সব বাটনা বাটতো, কীসব গুঁড়ো করতো,

থেঁতো করতো, গুলি পাকাতো, বৈয়ামে ভরতো। 'কবরেজমশাই' পাঁচন দিতেন, চ্যবনপ্রাশ মকরধ্বজ দিতেন, ত্রিফলাচূর্ণ দিতেন। চৌমাথার মোড়ে কবরেজমশায়ের কবিরাজখানাতে রোজ সন্ধ্যেবেলা 'পাড়ার মাথা'দের আড্ডা বসতো। কবরেজমশাই নিজে হুঁকো খেতেন, পাড়ার কত্তামশায়দের জন্যেও হুঁকো বেরুতো। এদিকের প্রায় সব বাড়ির কত্তাদেরই সন্ধ্যেবেলায় কবরেজমশায়ের আড্ডায় একবার করে দেখা যেত। আমাদের বাড়ির ইয়া গোঁফওলা কবি-কত্তাকেও। আড্ডা যখন জমতো, তখন বাড়ি থেকে বারংবার লোক পাঠিয়ে ডেকে ডেকেও কত্তাদের সহজে ফেরৎ আনা যেত না রাতের খাবার সময়ে। পাড়াটা যাঁরা পত্তন করেছিলেন, এ পাড়ার প্রথম বাড়িগুলো যাঁদের তৈরি, কবরেজমশায়ের আড্ডায় বসতেন সেইসব খোদ কত্তারা।

কবরেজমশাই কবে মারা গেছেন। সেখানে মণিহারী দোকান বসেছে, সেই প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর। সে কত্তারাও নেই, সে জমজমাট আড্ডাও ভেঙ্গে গেছে জন্মের শোধ। পাড়াটা সেই থেকেই যেন মাথা ন্যাড়া করে পিতৃহীন হয়ে রয়েছে। যদিও সারা প্রদেশের মাথা যিনি সেই মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এ-পাড়ারই ছেলে, পৈতৃক বাসভবনে আজও থাকেন এবং প্রাত্যহিক ঘোর অন্ধকারে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সন্ধ্যানিশি যাপন করেন। তবু তিনি কি 'পাড়ার মাথা?' পাড়ায় তাঁর বাবার যে জোরটা ছিল, সেই জোর কি তাঁর আছে?

পাড়া বলতেই আমার আজকাল মনে হয় কয়েকটি সঙ্গীর কথা, যে শৈশব-সঙ্গীরা আমার বাল্যকালকে উজ্জ্বল, অর্থবহ, পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তারা ছিল আমার প্রতিবেশী—আজ তাদের একজনও এই মানুষের শহরে বেঁচে নেই। কথায় বলে, 'লোকটার

বয়েসের গাছপাথর নেই।' আমার কি সেই বয়েস? মোটেই না। শুধু পাথর কেন, আমার বয়েসের ইঁট-কাঠ-জরি-ভেলভেট পর্যন্ত রয়েছে। দেখুন না মার ট্রাঙ্কে। কিন্তু গাছ? নেই। অন্তত আমার পাড়াতে প্রায় নেই বললেই চলে। যাদের সঙ্গে আমার ভাব ছিল, খেলা ছিল, যারা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী, আমার সেই প্রিয় গাছগুলি সবাই ছিল অন্যের বাগানে। পরের ধন। অথচ তাদেরই কল্যাণে আজ আমি এমন গেছোমেয়ে। এই তো গত বছরেই যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে গেলুম, দুপুরবেলায় দেখি একদল ছাত্রী করুণ নেত্রে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে একটি গাছের নিচে জমা হয়েছে। বেশ উঁচু, বড়সড় স্বাস্থ্য সবল গাছ। বয়স্ক, ভারিক্কি, সম্ভ্রান্ত এই পেয়ারা গাছের সাইজ প্রায় মহীরুহের—ওপর দিকের উঁচু ডাল-গুলো ডাঁশা ফলে ভর্তি। বললুম—'যাও না ওঠো, কয়েকটা পেড়ে খাও, কিছু হবে না—দেখো গাছ ভেঙো না।' শুনে তারা হেসেই অস্থির। যেন এত আজগুবি প্রস্তাব জীবনে শোনেনি। ঢোলা পেন্টুলুন শার্ট-গেঞ্জি পরা স্মার্ট সব কিশোরী কন্যা—পেয়ারার দিকে নজর ষোলো-আনা—গাছে ওঠার নামে এত হাসির কি আছে? তখন এই গেছো দিদিকেই কোমরে আঁচল জড়িয়ে মগডালে চড়ে ওদের পেয়ারা পেড়ে দিতে হলো! দেখে তাদের বিস্ময়ের শেষ নেই—'ও মা! ছ্যাখ ছ্যাখ—ডকটর দেবসেন গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ছেন।' (যেন 'ছ্যাখ ছ্যাখ ডকটর দেবসেন ফাঁসি কাঠে চড়ে পটল পাড়ছেন!') আসলে ওরা যা জানে না, সিঁড়ি ভাঙাটা কঠিন, গাছে চড়া সোজা। গাছকে ভালো-বাসলে তাদের শরীরের আটঘাট—অন্ধিসন্ধি জানা হয়ে যায়, তখন গাছে চড়াটা কোনো ব্যাপারই থাকে না। খাস শহুরে হলে হবে কি, গাছের সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসা ছোট থেকে। কুকুর বেড়াল

যেমন শহরেও ঘাস মাটি খুঁজে নেয়, আমিও তেমন গাছ খুঁজে নিতুম। অথচ আমি মোটেই নিসর্গ-প্রেমিক নই। মিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিনি দেবেন্দ্রনাথ নই। আমার যেমন জন্তু জানোয়ার ভালো লাগে, তেমনি ভালো লাগে বড় বড় গাছ। আসলে আমার ভেতরে একটা বুনো জন্তু আছে। সে ভেজা ঘাস দেখলেই খালি পায়ে হাঁটতে চায়, জল দেখলেই ঝুপুস করে নেমে পড়তে চায়, গাছে নতুন পাতা দেখলেই ছুঁতে হাত বাড়ায়। সেই বুনোটার সঙ্গেই ছিল গাছেদের নাড়ীর বন্ধন।

আমাদের বাড়িতে কোনো বড়ো গাছ ছিল না, কিন্তু জানলা দিয়ে দেখা যেত বিপুল এক বটবৃক্ষ। এখন যেখানে শিল্পী সুনীলমাধব সেনের ছিমছাম দোতলা বাড়ি, সেইখানেই ছিল তার বাস। মহান বিপুল বটবৃক্ষ—'লুটিয়ে পড়ে জটিল-জটা ঘন পাতার গহন-ঘটা' কতো যে তার ঝুরি ঝুলত, কতো হাজার হাজার পাখি এসে বসতো তার ডালে—বুকের মধ্যে আবার একটা কোটরও ছিল তার। আমি মনে ভাবতুম বুঝি সেই গর্তে 'ইলাবাসে'র বাস্তু সাপের বাসা। বিপুল বটবৃক্ষটি ছিল 'ইলাবাসে'রই বাগানে। কিন্তু সে কোটরে কোনোদিন সাপ দেখিনি। বটগাছতলার মাটিটা ছিল মোটা মোটা শেকড়ের জালি কাটা—উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো—খাঁজে খাঁজে বট ফল লেগে থাকতো, বৃষ্টি পড়লে ছোট ছোট তেকোনা পুকুরের মতো হয়ে জল জমে থাকতো—গাছতলাটা ছেয়ে থাকতো ঝরা পাতায় আর ঝরা ফলে। ডালে ডালে পাখির বাসা—সারাদিন চলত তাদের কিচির মিচির আর বটফল খাওয়া; পাখিদের দেখাদেখি আমারও প্রচণ্ড লোভ হতো বটফল খেতে। কী সুন্দর লাল টুসটুসে ফল, যেন লজঞ্চুস, আহা, যেন পাকা টোপা কুল। খায় না কেন মানুষ?

লোভ সামলাতে না পেরে একদিন খেয়ে ফেলেই বুঝলুম মানুষে কেন বটফল খায় না।

দক্ষিণ-পুবের সব ঘরগুলো থেকেই বট গাছটি দেখতে পাওয়া যেত। এ বাড়িতে আমি একলা শিশু। ঘরে বসে বসে গাছটি দেখতুম আর ওটাকে রবীন্দ্রনাথের বটগাছ বলে ভাবতে চেষ্টা করতুম—'দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা—কঠিন বাহু আঁকাবাঁকা। স্তব্ধ যেন আছে আঁকা শিরে আকাশপাট।' কিন্তু এ-গাছের নিচে কোনো পুকুর ছিল না—ছিল পীচ বাঁধানো রাস্তা। প্রায় এপার-ওপার ঢেকে সে তার বিপুল ছায়া বিছিয়ে রাখতো। গ্রীষ্মের দুপুরে কুকুর, গরু, মহিষ থেকে শুরু করে ঠেলাওলা, রিকশাওলারা তার ছায়াতে গাড়ি পেতে ঘুমোতো।

এত বড়ো একটা গাছ যার চোখের সামনে আছে, তার দিনের একটা মুহূর্তও একলা কাটে না, নীরস কাটে না। ওই গাছটার দিকে নজর রাখতে রাখতেই সারাদিন ব্যস্ত থাকতে পারতুম আমি। নাই বা থাকলো ঘরে ভাই-বোন, সঙ্গী-সাথী।

ওই গাছও যে কোনোদিন ওই জায়গায় থাকবে না, এ ছিল আমার কল্পনার বাইরে। এত জরুরী, এত মহান, এত বিরাট একটি অস্তিত্বও যে নিজের জন্মগত অধিকারে নিজে বেঁচে থাকতে পারে না মানুষের পৃথিবীতে, সেটা যেদিন আমার জানা হলো, সেদিনই আমার শৈশবের জগতে একটা মোটা চিড় ধরলো। আকাশে যেমন চন্দ্র সূর্য, রাস্তায় যেমন ট্রাম বাস, ঘরে যেমন বাবা-মা, ওখানে তেমনি ঐ বট গাছটার থাকার কথা। অত পাখি, অত ফল, অত ছায়া, এর কোনোটাই যে না থাকলে চলবে না!

একদিন একদল লোকজন এসে সেই গাছটার ডালপালা কাটতে

শুরু করলো। প্রথমে ভেবেছি গাছটা ছাঁটা হচ্ছে বুঝি, চুল ছাঁটার মতো। তারপর যেই বুঝেছি, না, গাছটাকে কেটে ফেলা হচ্ছে—আমি অস্থির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটোছুটি শুরু করলুম। বাবার কাছে একবার দৌড়োই, মার কাছে একবার। ক্রমান্বয়ে আর্জি পেশ করছি, গাছ কাটা বন্ধ করো, বন্ধ করো। বাবা মায়েরা তো সর্বশক্তি-সম্পন্ন। তাঁরা ইচ্ছে করলে কী না পারেন? কিন্তু সেদিন, সেই মুহূর্তে ঐ সর্ব-শক্তিমানেরাও চুপ করে রইলেন। চোখের ওপরে অমন প্রকাণ্ড মহীরূহ টুকরো টুকরো হতে হতে এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওখানে সমতল ভূমিতে ইঁটের পাঁজা বসলো। এ-পাড়ার পথবাসী প্রাণীদের দুপুরগুলো রোদ্দুরে ঠা-ঠা হয়ে গেল। আর আমার জীবনে দেখা দিল একটা মস্ত ফাটল।

বটগাছ মারা পড়লো, নিহত হবার সময়ে আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল, বাবা-মায়েরাও কত দুর্বল কত অসহায়! ঠিক ঐ বট গাছটার মতই!

প্রথম প্রথম আমি এ জানলা থেকে ও জানলায় ছুটে বেড়াতুম, কোনো ভেলকির আশায়, কোনো অপটিক্যাল ইলিউশনের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ যদি গাছটাকে দেখতে পেয়ে যাই? এ জানলায় না হোক, ও জানলায়? সত্যি সত্যিই অতো বড়ো গাছটা 'নেই' হয়ে গেছে?—এই সেদিনও তো ছিল—কতখানি জায়গা দখল করে, পাতাতে-ছায়াতে আকাশ মাটি জুড়ে—আর আজকে একেবারেই নেই। এও কি সম্ভব?

এখন ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারি। বটবৃক্ষের শোক তারপরে আমি আরও পেয়েছি। জীবনে একাধিক মহীরূহ এখন উৎপাটিত।

বাবা নেই, অথচ তাঁর 'ভালো-বাসা' গৃহ আছে। এও তো

সম্ভব। শ্বশুর মশাই নেই তাঁর অত প্রিয় প্রতীচী বাড়িতে, অথচ তাঁর গাই দুধ দিচ্ছে, তাঁর ধানক্ষেত ধান দিচ্ছে, তাঁর ফলের বাগান ফল দিচ্ছে। সবই আছে। সবই চলছে।

অতবড় গাছটা নেই, অথচ বাকী সবই ঠিক রইল। সবই যেমন কে তেমনি। 'ইলাবাসে'র বাগানে আমরা বিকেলে খেলতে যাই, রাস্তা দিয়ে প্রে-কাপ্রেওলা হেঁকে যায় দুপুরবেলা। সন্ধেবেলায় 'বেলফুল' কুলপি মালাই আসে। গাছটা নেই বলে কেউ কিছুই বাদ দেয়নি। কুকুররা অন্য ছায়া খুঁজে নিয়েছে। ঠেলাওলারা অন্য বিশ্রাম দেখে নিয়েছে।

সেই আমার প্রথম বৃক্ষ শোক। এ পাড়ার মাথা ছিল ঐ বটগাছ। পাড়াটাকে পিতৃহীন করে গেছে ঐ গাছ, ঠিক যেমন পাড়াটা পিতৃহীন হয়েছে কবরেজমশায়ের আড্ডাখানা উঠে গিয়ে।

'ইলাবাসে'র গৃহস্বামী ছিলেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। তাঁকে আমার ভালো মনে নেই—বারান্দায় আরামকেদারায় বসে থাকতেন চশমা চোখে ফতুয়া গায়ে সুনন্দা-কাজলদিদের দাদু, আমার একজন জ্যেঠামশাই—এই পর্যন্ত মনে পড়ে। কিন্তু তাঁর বাগানে ছিল আমাদের 'মণিমেলা'। আমার বটগাছের প্রায় পাশেই ছিল একটি ছোটখাটো রোগাটে গাছ, ঝিরঝিরে পাতার ফাঁকে আকাশ-বাতাস বয়ে যাচ্ছে, বাঘনখের মতো বাঁকা বাঁকা ধবধবে শাদা ফুল ফুটতো তাতে। বেসন-মাখা হয়ে ভেজে খাবার জন্যেই যেন তাদের ফোটা। রোগা রোগা তার ডালপালা এত নরম, যা বড়রা চড়তে সাহস পেত না, কাঁধে করে তুলে দিত আমাকেই। বকফুল পেড়ে দিতে। সেই শুরু আমার গাছে চড়ার। 'ইলাবাসে'র পেছনদিকে ডানপাশে একটা ঝাঁকড়া জামরুল গাছ ছিল, মস্ত উঁচু, তাতে থোকা থোকা

জামরুল ফলতো। অত উঁচু গাছে ওঠা সহজ নয়, কিন্তু নামাটা আরো শক্ত। ভাগ্যিস 'ইলাবাসে'র দক্ষিণ দিকে একটা একতলার ছাদ মতো ছিল, জামরুল গাছের ডাল ধরে তার ওপরে লাফিয়ে পড়া যেত। সে ছাদেও এখন ঘর উঠে গেছে। সে গাছও আর নেই। আর বকফুলের গাছটাও বট গাছের কিছুদিন পরেই একদিন উধাও হয়ে গেল।

বাগচী বাড়ির এই গাছেদের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে 'জাগৃহি' ক্লাবের খেজুর গাছ দুটোর কথা। সোনারং পাকা খেজুরের গুচ্ছ ঝুলে থাকতো গাছের ডগায়। মেয়েদের মধ্যে খেজুর খাবার লোভ টনটনে, এদিকে লেডিলাইক হবার ইচ্ছেও কম নয়। তারা ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেজুর পাড়তে চেষ্টা করত। অযথা বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে আমি একদিন যেই না উঠেছি, সেই হয়ে গেল সর্বনাশ। জামরুল গাছ থেকে নামার চেয়ে খেজুর গাছ থেকে নামা ঢের বেশি প্রাণান্তকর। ছালচামড়া উঠে যায়। সর্বাঙ্গ চেঁছেছুলে যায়। খেজুর গাছের দেহভর্তি খোঁচা। কিন্তু বড় মেয়েরা মহা ওস্তাদ— 'আহা, নবনীতার মতো খেজুর গাছে উঠতে কেউ পারে না' —বলে আমাকে বেলুন ফোলান ফুলিয়ে শেষটায় ঠিক খেজুর গাছে উঠিয়ে ফেলতো। আর তারপর আমি ফ্রক ছিঁড়ে গা-হাত-পা ছড়ে রক্তাক্ত শরীরে নেমে প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের কথা ভাবতে ভাবতে বীরদর্পে তিনটে পাকা খেজুর কোঁচড়ে নিয়ে বাড়ি আসতুম।—'একটা তোর, একটা তোর বাবার, একটা তোর মার'—বাকিগুলো 'দিদিরা' খেয়ে নিতো। হায় মানুষের অহম! অহমের কিবা শৈশব, কিবা বার্ধক্য। 'আমার মতন খেজুর গাছে উঠতে কে-উ পারে না'—এই মহৎ গর্বে আমার গা-ময় কাটাকুটিগুলোকেও কষ্ট বোধ হতো না। কিন্তু

বাড়িতে ছিল গুনিয়াভাই, আমাদের রাধুনী-কাম্ গার্জেন। বাড়ির গৃহিণীরও গৃহিণী। একদিন আমার ছিড়ে যাওয়া ফ্রক আর ছড়ে যাওয়া চামড়া দেখে গুনিয়াভাই খুন্তি হাতে 'জাগৃহি' ক্লাবে গিয়ে হাজির। খাস ঢেনকানলের শান দেওয়া ওড়িয়া ভাষাতে বড় মেয়েদের এইসা ধমক দিয়ে এল—'মু দেখিবি কি পিটিবি' বলে, যে তারপর থেকে কেউ আমাকে খেজুর গাছে চড়তে উৎসাহ দেয়নি। সেই ক্লাবও নেই সেই মাঠও নেই। সেখানে এখন সাততলা ফ্ল্যাট বাড়ি।

কিন্তু জীবনে এখনো অজস্র খেজুর গাছ আছে, আর আছে 'নবনীতার মতো খেজুর গাছে চড়তে কে-উ পারে না' বলবার মতো সঙ্গীও। আর তাদের সেই উস্কানিতে নেচে ওঠবার মত নবনীতাটিও মজুত আছে আমার মধ্যে। নেই কেবল একজন জবরদস্ত গুনিয়া-ভাই যে 'দেখিবি কি পিটিবি' বলে উস্কানিটা ঠাণ্ডা করে দিতে পারে।

অবশ্য খেজুর-জামরুলদের সঙ্গে আমার ঠিক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল না, যেমন ছিল সামনের বাড়ির গন্ধরাজ গাছ দুটির সঙ্গে। দক্ষিণ-পুবে যেমন বাগচী বাড়ি উত্তর-পশ্চিমে তেমনি সরকার বাড়ি। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের দাদা বিজয়কুমার সরকারের বসতবাটী। ও বাড়ির সামনের ছোট্ট বাগানে আমার পাঁচটি প্রিয় ফুলগাছ ছিল। তাদের মধ্যে একটিও আজ নেই। নীচু লোহার রেলিং ঘেরা ছোট্ট বাগানের ঠিক মাঝখানে নিচু লোহার গেট—তার দুপাশে দুটি গন্ধরাজের গাছ। ফুলে ফুলে ভরা। কোনো না কোনো কারণে যখনই আমাকে ফুটপাথ দিয়ে যেতে হতো, হয়ত পেন্সিল কিনতে কিম্বা লাইব্রেরির বই বদলাতে, কিম্বা কৃষ্ণাদের বাড়ি খেলতে —যেখানেই হোক, যখনই হোক, ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে

যেতে আমাকে একটা রিচুয়াল করতেই হতো।—এটা ছিল আমার আবাল্যের অভ্যাস—দু হাত উঁচু করে ওই গন্ধরাজ গাছ দুটির পুষ্পিত ডালপালা একবার করে ছুঁয়ে যাওয়া। ছেলেবেলায় সে স্পর্শ বড় সহজ ছিল না, প্রত্যেকবার লাফাতে হতো। যে করে হোক লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একবার করে ছুঁয়ে যেতেই হতো প্রত্যেকটা গাছকে। ক্রমশ ছোঁয়াটা সহজ হয়ে এল। শেষে শুধু গোড়ালি তুললেই হাত পেতুম ডালে। ওটি নিত্যকর্ম পদ্ধতির মধ্যে পড়তো। নইলে ও পথে আমার যাওয়াই হতো না—না ছুঁয়ে গেলে গাছগুলোই বা কী মনে করবে? ওদের মনে কষ্ট হবে না? ওদের অবহেলা করা হবে না? এমন একটা ভাব দেখানো হবে না, যেন ওরা আমার আসা-যাওয়ার পথে ফুলসুদ্ধ ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে নেই? কী ফুল, কী ফুলই ধরতো ওই দুটি গাছে! রোজ ভোরবেলায় ফুল-চোরেরা এসে সাজি ভরে তুলে নিয়ে যেত বিজয়বাবুর বাড়ির গন্ধরাজ, তবুও ফুল থাকতো গাছে। ফুলের দেশে আমরাও প্রত্যেক দিনই গন্ধরাজ ফুল তুলেছি, সরকার বাড়ির কেউ বাধা দেননি। সেই থেকেই বোধ হয়, আজও গন্ধরাজ আমার প্রিয়তম ফুল।

গন্ধরাজ গাছের পিছনেই ছিল বেঁটে খাটো ঘনশ্যাম দুটি কামিনী ফুলের ঝাড়। প্রতি বর্ষায় ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত, আর বৃষ্টির পরে ধবধবে ফুলের বিছানা পেতে দিত বাগানের সরু পথটায় আর মাটিতে। এত তীব্র মদির সেই কামিনী ফুলের সুবাস, আমাদের উত্তরের বারান্দা পর্যন্ত ভেসে যেত তার দাপটে।

সরকার বাড়ির পাঁচিল এখন খুব উঁচু। সে কামিনী গাছেরা আছে কিনা জানি না। উত্তরের বারান্দা থেকে তাদের খবর পাই না আর বৃষ্টির দিনে। গন্ধরাজের গাছ দুটিও নেই। ওদের গেটের

মুখ আর ছায়া ছায়া নয়, রৌদ্রকরোজ্জ্বল স্বাস্থ্যসম্মত।

সরকার বাড়ি আর মুখুজ্যে বাড়ির মাঝের পাঁচিলটার গা বেয়ে ছিল একটা চাঁপা গাছ, সরকারদের বাগানে। গাছটি ভারী সুশ্রী—দেখলেই আমার 'তন্বী' শব্দটা মনে পড়ে যেত। রোগা, লম্বা, ঝরঝরে, প্রায় দোতলার জানলার কাছে পৌঁছুতো তার মাথা। হাল্কা সবুজ রঙের কচি কচি পাতায় সেজে থাকতো সারা বছর—দেখতে খুব ভালো লাগতো আমার। সোনা-সোনা স্বর্ণচাঁপা ফুল ফুটতো সে গাছে, তারও যেন পাগলকরা গন্ধ। রাজকন্যেদের আঙুলের মতো দেখতে সেই সব চাঁপার কলি। তবে চাঁপা গাছে অতো ফুল কিন্তু ধরতো না—গন্ধরাজ কি কামিনীর মতো, কিম্বা আমাদের বাড়ির রক্তকরবীর মতো, তবুও ওই গাছটা আমি খুব ভালোবাসতুম। আগে পাঁচিলে চড়ে তারপরে চাঁপা গাছের সবচেয়ে নিচের ডালটাতে উঠতে পারা যেত।

সরকার বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে—আমার বন্ধু রাণী। রাণীর দিদি বাণী আমাদের চেয়ে কিছু বড় ছিল। যখন তার তেরো-চোদ্দ বছর বয়স কিম্বা হয়তো এগারো-বারো, ঠিক জানি না, খুব একটা কঠিন অসুখে বাণী বিছানা নিল। তার খেলতে আসা বন্ধ হয়ে গেল। চাঁপা গাছটা বাগানের যেদিকে, সেদিকেই একতলার একটা ঘরে শুয়ে থাকতো বাণী। চাঁপাগাছের ডালে বসে বসে শুয়ে থাকা বাণীকে দেখতে পেতুম জানলা দিয়ে। কিছুদিন শুয়ে থেকে বাণী একদিন মিলিয়ে গেল। সেই আমার প্রথম বন্ধুর মৃত্যু। কিন্তু কিছুই বুঝিনি। বাণীর মৃত্যুর পর থেকে ঐ স্বর্ণচাঁপা গাছটা আমার মনে মনে কেন জানি না বাণীর সঙ্গে বিনিসুতোর বাঁধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। সরকার বাড়ির সামনের বাগান এখনো আছে, ওদের

ছোট শিউলি গাছটা বড়ো হয়েছে। হয়তো লঙ্কা জবার ঝাড়টাও আছে। কিন্তু আমার প্রিয় গাছেরা কেউ নেই। ওরা গেল কোথায়? কেন গেল?

অন্যের বাগান, সে বাগানের কোনো ফোটো নেই আমাদের অ্যালবামে, কিন্তু তার ছাঁচ তোলা আছে আমার মগজের মধ্যে। যাদের বাগান, তারা হয়ত রাগই করবে আমার ওপরে। কিন্তু ওদেরই কি মন কেমন করে না, ওই সব গন্ধরাজ, কামিনী, চাঁপাদের জন্যে? নিশ্চয়ই করে।

এবার আরেকটি গাছের কথা বলি—তার ভূমিকা আমার জীবনে প্রায় ঐ বট গাছটার মতোই জরুরি—আর তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল দীর্ঘতম। সেই গাছ প্রত্যেক দিন মাথায় করে সূর্যকে তুলতো আকাশে, পূর্ণিমার চাঁদকে ঢাকবার চেষ্টা করতো ঝিরিঝিরি পাতার ওড়না দিয়ে, কালবোশেখী দেশে এসে প্রথমেই তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে যেতো। জাপানী কাবুকী নাট্যের সূর্য নৃত্যের মত সে মাথা ঝাঁকিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি করতো প্রত্যেকটা ঝড়ে। আর ঝড় থেমে গেলেই মাথা উঁচু করে খাড়া থাকতো, প্রস্তুতিতে—একটু পরেই তারার চাঁদোয়া বাঁধতে হবে মাথায়। সেই নারকোল গাছটা ছিল আমার দিন-রাতের সঙ্গী। আমার ঘরটা পুবে আর আমার ঘরের ঠিক সামনেই সেই নারকোল গাছ, ডকটর এন কে বোসের বাড়ির উঠোনে, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের বাড়ির উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে উঠে গেছে আকাশ ফুটো করে। এতদিন খাড়া ছিল গাছটা একই জায়গায়—ছায়া দিত না, কিন্তু সাহচর্য দিত। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে ওর সঙ্গেই প্রথম 'গুড মর্ণিং' হয় খাটে বসে। মাঝ রাত্রে ঘুম না এলে কি ঘুম ভেঙে গেলে জানলা দিয়ে তাকিয়েই

ভরসা পেয়েছি, ঠিক দাঁড়িয়ে আছে নারকোল গাছ। সদা-জাগ্রত প্রহরীর মতো জানলা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। ওর দিকে চেয়ে থাকলে আমার ছেলেবেলার একা ঘরের ভয় কেটে যেত। কত বয়স ছিল ওর কে জানে? আমি শুধু জানি, আমার জীবনের প্রথম গদ্য আমি লিখেছিলুম তাকে নিয়েই, এক কালবোশেখী ঝড়ে তার মাতা-মাতির গল্প। বেরিয়েছিল স্কুল ম্যাগাজিন 'সাধনা'তে। তখন বয়স সাত। ও গাছে ডাব ধরতো প্রচুর। তার স্বাদ জানি না। কিন্তু ও গাছের ঝরে-পড়া পাতায় চেপে বসেছি অনেক—পাড়ার বন্ধুরা মিলে ডাঁটি ধরে টেনে নিয়ে গেছে পিচের পথের ওপর দিয়ে। উঃ সে কী আনন্দ, সে কী উত্তেজনা! যেন সমুদ্রে সার্ফিং করার মতো রোমহর্ষক।

গেল বছর এক ঝড়ের রাতে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হলো তার মাথায়। সকাল বেলা জানলা দিয়ে দেখতে পেলুম তার জ্বলে-পুড়ে যাওয়া মূর্তি। তারপর এলো ভাড়াটে হাড়ি-ডোমেরা, শুইয়ে ফেললো আমার আজন্মের সঙ্গীকে। এখন আমার জানলা দিয়ে রাত্রিবেলা আর কেউ উঁকি দেয় না। কেবল বাড়ি। আকাশ। বাড়ি। ইট। পাথর। ইট। আমার বিশ্বাস জ্যোতিবাবুর মনেও দুঃখ রয়েছে বুড়ো নারকোল গাছটার জন্যে। ওর ঝাঁকড়া মাথাটা উঁচিয়ে ছিল বলেই তো টি ভি-র এরিয়েলটা ওঁরা সরিয়ে লাগিয়েছিলেন। সব 'জনগণদের মানুষের' মধ্যেই একজন করে নির্জন মানুষ তো যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে, সেই মানুষটার সঙ্গে নারকোল গাছটার অনেকদিনের চেনা ছিল।

এতগুলি শৈশবসঙ্গী আজ নেই। কিন্তু গোপনে বলি, শৈশবের বৃক্ষকুল এখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি। 'দূর থেকে আমি তারে সাধিব' গোছের দু'একটি এখনও আছে। এ বাড়ির ছাদের পিছন থেকে

ও বাড়ির দেয়ালের পাশ থেকে উঁকি মারে তারা। একজন হলো আমাদের পাশের বাড়ি জলাবাড়ির বিশ্বাসদের বাড়ির 'পাম' গাছ। সে ঠিক আমার সমবয়সী—আমার ছোটবেলাতে সেও খুবই ছোট ছিল। এখন তিনতলার ছাদ ছাড়িয়ে দিব্যি দিশি নারকেল গাছটি হয়ে 'উঁকি মারে আকাশে'। ওর দিকে তাকিয়ে আমি আমার জানলার বুড়ো নারকেল গাছের দুঃখু ভোলার চেষ্টা করি।

আর যে-দুজনের কথা বলবো তারা আমার গুরুজন। তাদের আজন্মই এই একইরকম দেখছি। একজন এক পরমাসুন্দরী নিমগাছ, ওই ডকটর এন কে বোসের জমিতেই। ফাল্গুন মাস পড়লেই সেই গাছে আমার ছোট্টবেলার কোকিলটা এসে বসে—লুকিয়ে লুকিয়ে ডাক দেয় 'কু-উ! কু-উ!' আর আমি ভেংচি কাটলেই রেগে গিয়ে তিনগুণ জোরে চেঁচাতে শুরু করে। এখনও নিম ফুলে ফুলে শাদা হয়ে যায়, সে গাছের তলা দিয়ে যাবার সময়ে আজও আঙুরের মতো টুসটুসে নিমফল মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাই। বুড়ো নারকেল গাছের তিরোধানের পর থেকে সূর্য এসে নিমগাছের ফাঁকেই উঁকি দেন, ওরই পাতার বেড়াজালের পেছনে পূর্ণিমার চাঁদ ধরা পড়ে যায়। ভাগ্যিস ছিল নিমগাছটা? নইলে কোথায় আশ্রয় পেত আমার ঊষা, আমার নিশা? আরেকটি গাছ দেখা যায়—পাঞ্জাবিদের বাড়ি আর জ্যোতি বোসেদের বাড়ির মাঝামাঝি, একটা আমগাছ।—জন্মইস্তক কলকাতা শহরে বসন্ত ঋতুকে ডেকে আনে এই দুজনে। আমগাছটা বৌলে বৌলে ছেয়ে যায় যেন তুষারপাত হয় ওর মাথায়—আর তক্ষুনি খবর পেয়ে চলে আসে সেই ঝগড়াটে কোকিলটা, নিমগাছের পাতার ফাঁকে লুকিয়ে বসে ডাকাডাকি জুড়ে দেয়। প্রকাণ্ড হয়ে আসছে আমার যতদূর স্মৃতি যায় ততদূর থেকে। এ গাছ দুটোকে

পুরোপুরি দেখিনি কোনোদিন ছুঁইনি কখনো, তবু এরাই আমার ছোটবেলার সেই পাড়ার খানিকটা ধরে রেখেছে এখনও।

কেবল ভয় করে, এমন দিন হয়তো আসবে যেদিন এই গাছদুটিও আর থাকবে না। কোকিলটা আর আসবে না এ পাড়াতে। সেদিন থেকে আমার বয়েসেরও আর গাছ-পাথর থাকবে না।

প্রথম প্রত্যয়

এক কবির গর্ভে আরেক কবির ঔরসে আমার জন্ম। অক্ষরের জগৎটাই যার ভিটে মাটি, ঘর সংসার, সে আর কবিতা লিখবে না কেন।

যেমন আমার গাছে-চড়া, বৃষ্টিতে ভেজা, কাগজের নৌকো গড়া, তেমনিই আমার কবিতা লেখা। কবিতা আমার জীবনে আক্ষরিক অর্থেই সহজ। একা বাড়ির একলা শিশু, কবিতা আমার স্বভাব-সঙ্গী। আশৈশব।

এতৎসত্ত্বেও একটি কবিতা লিখতে আমার সময় লাগে অনেক। পরিশ্রম হয় প্রচুর। কবিতা কষ্টসাধ্য। সুখদা নয় মোটেই, স্বয়মাগতা হলেও না। তাকে আপ্যায়নের অনেক ঝঞ্ঝাট। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন কবিতার ব্যাখ্যা দেওয়া।

আমার জীবিকা যদিও সাহিত্যের মাস্টারি, তবুও চেষ্টা করি পারতপক্ষে আমাকে যেন কবিতা না পড়াতে হয়। ও হচ্ছে জ্যান্ত প্রজাপতির পাখনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে প্রাণী বিজ্ঞান শেখানোর মত কঠিন কাজ। আর, তারও চেয়ে কঠিন কাজ নিজের কবিতা নিয়ে নিজেই লিখতে বসা। এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ? আমিই যদি সব লিখে রেখে দিই, তবে অন্যরা আমার কবিতা নিয়ে আর কষ্ট করে ভাবতে যাবে কেন? তাছাড়া নিজেকে অতটা গুরুত্ব দেবার মধ্যে কেমন একটা দম্ভের দীনতা আছে না? কতটুকুই বা লিখতে পেরেছি?

কই বাল্মীকি, কালিদাস, কবীর, চণ্ডীদাস কেউই তো আপন কবিকৃতি নিয়ে ফোটোগ্রাফ-সংবলিত দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে যাননি। তাতে তাঁদের পরিচিতির অসুবিধে হয়েছে ?

কিন্তু আমাদের কথা আলাদা, উদার অসীম কাল নয়, হয়তো বা গণ্ডূষ কালই মাত্র আমাদের সময়। সম্পাদক মশাই যদি সেই গণ্ডূষ-টুকু যুগিয়ে দেন, শফরীর ফরফরানি থামাবে কে ?

॥ ১ ॥

জানি বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি সত্যিই আমার দু' চোখ দু' রকমের। ডান চোখটা সর্বদা মিটিমিটি হাসে, শোকের বাড়িতেও নির্লজ্জ, সে শুকনো থাকে—আর বাঁ চোখটা একদম হাসে না, তার গড়নটাই কেমন দুঃখী-দুঃখী। যেন ট্রাজিডির মুখোশ থেকে চুরি করেছি। আমি হেসে কুটিপাটি হলেও বাঁ চোখ আপনমনে দুঃখী হয়ে থাকে। এভাবেই বড় হয়েছি। আমাকে বেলা একবার বলেছিল —'তোর জীবনে মাঝামাঝি কিছু নেই। সবই তুমুল, সবই তীব্র। তীব্র সুখ, তুমুল যন্ত্রণা।" কে জানে, হয়তো বা তাই। এটা ঠিকই, জীবনে আমার যা কিছু প্রাপ্তি, সবেতেই একটা চরম ব্যাপার থেকে যায়। কিন্তু শিল্পে ? শিল্পেও কি তাই ? হাসিহাসি-চোখটা দিয়ে লিখি খোশ গল্প। দুঃখী চোখটা তাকিয়ে থাকে কেবল ভিতর পানে, কবিতা লেখে। আর, দুটো চোখ সমান করে ভিতর বাইরে পাশা-পাশি মেলে রেখে লিখি প্রবন্ধ, উপন্যাস। কিন্তু গদ্য তো নিয়মিত

লিখতে শুরু করেছি মাত্র এই সেদিন—কবিতাই আমার প্রথম প্রত্যয়। কবিতার দর্পণেই নিজের মুখ দেখেছি প্রথম।

আজন্ম একলা ঘরে যে মানুষ, সে একাকিত্বে ভয় পায় না। কিন্তু জানি একদিন বয়স হবে, ব্যাধির প্রতাপ আরো বাড়বে, ক্ষমতা নিবে যাবে, ফাঁকা হয়ে যাবে বৈঠকখানা ঘর। বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতাকেও আমি ভয় করি না, আমার একটাই ভয়, কবিতা যেন আমাকে শেষদিনে পরিত্যাগ না করে। সে নিঃসঙ্গতা পক্ষাঘাতের মত ; সে বড় ভয়ানক্ হবে। কবিতা আমার নাড়ীর সঙ্গে জড়ানো কবচ কুণ্ডল। কবিতা আমার অভিমান, আমার প্রার্থনা, আমার নিঃসঙ্গতা, আমার সঙ্গ, আমার পূর্ণতা, আমার অতৃপ্তি। কবিতাই সত্য অর্থে সেই "বিজন জীবন বিহারী"। জীবনের গহনে যে বিজন জীবন সেখানে যে ছায়াময় অনুভবের গোপন সঞ্চার, তার অনুরণনটুকুও স্বচ্ছন্দে ধরে ফেলতে যে পারে, সেই পরম ফাঁদের নাম কবিতা। শূন্য গগনবিহারী ভাবকে ভাষার মোহন মরণে বিদ্ধ করে ফেলতে জানে যে বিচিত্র ছলনা, তারই নাম কবিতা। সেই কবিতাকে কখনোই অবসনা করে ফেলা যায় না, অন্তরাল থেকে তাকে বসন যুগিয়ে যান স্বয়ং মহাকাল —কোনো দুঃশাসন কবি, সমালোচকের সাধ্য নেই যে সত্যিকারের কবিতাকে, তার জন্মসূত্র থেকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে শেষ কথাটি বলে দেয়। ভালো কবিতা যুগে যুগে উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলে। চিরকালের পায়ে সে নূপুর হয়ে জড়িয়ে থাকে। যে কবিতা ফুরোয় না, আজ পর্যন্ত তেমন কবিতা কি লিখতে পেরেছি? জীবনের প্রত্যেকটি কবিতাই বোধ হয় সেই কবিতাকে খোঁজার চেষ্টা।

খুব ছেলেবেলায়, সারা দুপুর একা বাড়িতে ঘুরঘুর করতুম। মা'র খাটের পাশে পেতলের ঝকঝকে সরু শেকল থেকে ঝুলতো একটি

ছবি, রঙিন। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর। ক্রুশের তলায় লেখা ছিল : INRE। আমি খাটে উঠে দাঁড়িয়ে একমনে চেয়ে চেয়ে দেখতুম, ফর্সা যীশুর হাতের পাতায় ফোটানো পেরেক থেকে রক্ত ঝরছে, রোগা পায়ের পাতা থেকে রক্তের ধারা, কাঁটার মুকুটের তলায় কপাল বেয়ে রক্ত, কিন্তু আকাশে-তাকানো চোখে কী শান্তি, ঠোঁটে মৃদু হাসি। ছবিটা আমাকে সারাদিন টানতো। কী আশ্চর্য ছবি। এত কৃশ লোক, সর্বাঙ্গে এত যন্ত্রণা, এত রক্ত, তবু এমন চাহনি! এমন হাসি! আর ওই যে পাশাপাশি চারটি ইংরিজি অক্ষর—ওরই বা মানে কী? রক্তের ধারায়, রহস্যময় হাসিতে, রহস্যময় অক্ষরে, সংযম দিয়ে ক্ষমা দিয়ে যন্ত্রণাকে জয় করবার ওই আশ্চর্য চেহারা, মানুষের চরম জয়ের কাহিনী ওই যীশুর ছবি আমাকে জাদু করেছিল, আমাকে ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলেছিল। এখনও ব্যাধিতে যখন প্রচণ্ড কষ্ট পাই, তখন ওই ছবিটি আমার মনে পড়ে। আমাকে সহ্যশক্তি দেয়। কবিতার যদি কোনো ছবি আঁকা যেত, সে ছবিটি হতো ঠিক ছেলে-বেলার ওই যীশুর ছবির মত। আজ কবিতার কথা লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ে গেল যাকে।

যীশুর ওই ছবিটির নিচেই ঝুলতো ক্যালেণ্ডার। তাতে তারিখের গায়ে লেখা থাকতো চাঁদের নানা অবস্থার শাদা কালো ছবি—ঝুলন-যাত্রা, দুর্গা পুজোর ছোট্ট ছোট্ট প্রতীকী ছবি। তলায় ফুটনোটে জানানো থাকতো কবে কবে গৃহপ্রবেশ, উপনয়ন, গাত্রহরিদ্রা প্রভৃতি বিধেয়। লেখা থাকতো কত তিথির নাম—অক্ষয় তৃতীয়া, ভূত চতুর্দশী। আমার কিন্তু সব থেকে ভালো লাগতো তিনটি গোপন শব্দ। খুব মন দিয়ে আমি প্রায়ই ক্যালেণ্ডার পড়তুম। 'ফাতেহা-দোয়াজ-দাহাম্' শব্দটা আমার দারুণ ভালো লাগত। 'ফাতেহা' যেন কাঁসির 'কাঁই

নানা' বলছে, আর 'দোয়াজ-দাহাম্' ঢ্যাম কুড়কুড় ড্যাডাংড্যাং বলে ঢাকের বাদ্যি জুড়ছে। স্পষ্টই যেন ঢাক ঢোলের বাজনা শুনতে পেতুম ওখানে আমি। দু' নম্বর গোপন শব্দ ছিল 'ইদুজ্জোহা'। মনে মনে 'ইদুজ্জোহা' শব্দে চড়ে আমি দূর পাল্লার ট্রেনে দীর্ঘ নদীর ব্রিজ পার হয়ে যেতুম গভীর রাত্রি বেলায়। সুর করে 'ইদুঃজ্জোহা' 'ইদুঃজ্জোহা' 'ইদুঃজ্জোহা' বলতে বলতে ট্রেনটা নদী পেরিয়ে যেত। তেমনি 'ইদল্-ফিতর্' চরকা কাটত। চাঁদে। চাঁদের মা বুড়ী যে চরকা ঘোরায় তার শব্দটা কেউ শুনেছেন? এই শুনুন—ইদল্—ফিতর্···ইদল্—ফিতর্···ইদল্—ফিতর্···কেমন? ঠিক বলেছি না?

এই তিনটে গোপন শব্দ আমার কাছে কবিতার মত, এরা আমাকে ছবি দেখাত, বাজনা শোনাত, অ-নেক দূরে নিয়ে যেত।

কিন্তু কই আরো তো শব্দ ছিল ক্যালেণ্ডারে। 'দোল পূর্ণিমা' কিংবা 'ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া' এ সব কথায় তো সেই বাজনা শোনা যেত না? অথচ ছন্দ নেই তা নয়। এতকাল ব্যাপারটা রহস্য ছিল। সেদিন আমার কিশোরী কন্যা রহস্য ভেদ করে দিয়েছে—"কেন ও রকম হয়? শব্দগুলোর মানে বোঝ না বলেই। যদি ফার্সি জানতে, তাহলে আর শব্দগুলো এমন কবিত্বময় থাকতো না, একাদশী-পূর্ণিমার মতই হয়ে যেত।"

সত্যিই তো? শব্দগুলোর মানে জানি না বলেই ওরা বিশুদ্ধ সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে, শুধুমাত্র ধ্বনিতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় ওদের পূর্ণ পরিচয়। বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞায় বন্দী নয় বলেই ওরা আমার কাছে বিশুদ্ধ ছন্দ-ঝঙ্কার, বিমূর্ত ব্যঞ্জনা। একদম ঠিক কথা। একটু পর্দা, একটা আব্রু, কিছুটা রহস্য থাকা চাই। এটা কবিতার অত্যাবশ্যক ধর্ম। "দেখা না-দেখায় মেশা" বোধের অতীত এক বিদ্যুৎলতার

উপস্থিতি চাই কবিতায়। 'দ্য লা ম্যুজিক আভঁ ত্যুলে শোজ', সবার আগে সঙ্গীত। ভের্লেন সাধে বলেছেন ?

এক-একটা শব্দ ছোটবেলায় প্রায়ই আমাকে জাদু করে ফেলত। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া হলে কি হবে, নবনীতা নামটা আমার একদম পছন্দ ছিল না। ওতে কোনো ছবিও নেই, বাজনাও বাজে না। স্কুলে যাবার পথে একটা সাইন বোর্ড দেখতুম হাজরার মোড়ে—বীণাপাণি বিপণি। সারাদিনই নামটা কানের মধ্যে গুনগুন করে গানের মতো বাজতো। একদিন বুদ্ধি করে আমার সব খাতা-বইয়ের মলাটে পুরোনো নাম কেটে দিয়ে, নতুন নাম লিখলুম কুমারী বীণাপাণি বিপণি দেব। খাতা বই দেখে মা তো হেসে কুটি কুটি। বাবা পর্যন্ত হেসেছিলেন ছাদ ফাটিয়ে। সে দুঃখু সে লজ্জা আমি ভুলিনি। 'বিপণি' মানে না জানায় এই বিপর্যয়। এখনও ছোটবেলার কয়েকটি বইতে ঐ নাম লেখা আছে।

আর একদিন স্কুল থেকে ফিরছি, রাস্তায় এক বাড়িতে রেডিও বাজছিল, কানে এল, "কুয়ালালামপুর···কুয়ালালামপুর···এলাম কত দূর··· এলাম কত দূর···" অমনি লাইনটা মাথার মধ্যে সেই যে জড়িয়ে গেল আজও ছাড়াতে পারিনি। ছন্দ-অনুপ্রাস-মিল ছাড়া ওতে ছিল দুটি মহা মূল্যবান বস্তু—দূরত্ব আর রহস্য। আমি তখন জানতুম না কুয়ালালামপুরের ভৌগোলিক অস্তিত্বের ঠিকানা। ওই অপরিচয়টুকুর মধ্যেই ছিল রোমান্টিক আহ্বান। পুরো কবিতাটি আমি আজও জানি না। বহর-রমপুর বহর-রমপুর বললে এটা কিন্তু হবে না !

পুরো কবিতা সব সময়ে না জানলে যে ক্ষতি হয়, তাও নয় অবশ্য। যেমন অমিয় একবার নজরে পড়িয়ে দিয়েছিল "কী ফুল

ঝরিল বিপুল অন্ধকারে—" এই পঙ্‌ক্তিটির অসামান্য হাহাকার মাত্র ওই এক লাইনেই শেষ। এর গৌরব নষ্ট হয়ে গেছে কবিতাটির পরবর্তী অংশে। আমাদের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ও গানটি মাত্র এক লাইন লিখলেই যথেষ্ট হত। অফুরন্ত হত।

॥ ২ ॥

এম এ পড়ার সময়ে অমিয়, প্রণবেন্দু আর আমি ছিলুম অভিন্ন-হৃদয়। তিনজনেই কবিতা ভালবাসতুম। যে যা নতুন পড়তুম, যে যা নতুন লিখতুম তক্ষুনি পরস্পরকে না দেখিয়ে না পড়িয়ে তৃপ্তি ছিল না। ভোর ছ'টার সময়েও পাট ভাঙা কবিতা পকেটে নিয়ে প্রণবেন্দু চলে এসেছে কতো দিন। সেই সময়ে অমিয়র গোটা "পূর্ব মেঘ" মুখস্থ ছিল। দক্ষিণের বারান্দায় মাদুর পেতে বসে এক আষাঢ়ের প্রথম দিনে আমরা ওর আবৃত্তি শুনেছিলুম।

সদ্য নতুন নতুন বিদেশী ভাষা শিখেছি তখন, অমিয় আর আমি ফরাসী, রুমি, মানব আর আমি জর্মন শিখতুম। নিত্য নতুন ছাড়পত্র জুটছে নিত্য নতুন বিশ্ব উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। কত যে ফরাসী কবিতা অমিয় আর আমি একসঙ্গে বসে মুখস্থ করেছি সেই সময়ে—ভের্লেন, বদলেয়ার, র‍্যাঁবো, ভালেরি, মালার্মে, আপলিনেয়ার। —"ইল প্লার দঁ মঁ ক্যর কমিল প্ল্য স্যুর লা ভিল্" 'জঁ স্যুঁয়িউন ওত্‌র্' "ল্য ভিয়ের্জ ল্য ভিভাস এ ল্য বেল্ ওজুরদুয়ী", "স্যু লা পঁ মিরাবো কুল্‌ল্য স্যেইন", "জ' স্যুয়ি কম্ ল্য রুয়া দাঁ পাই প্লুভিয়ু···" 'লা শ্যেরে ত্রিস্ত! এলা/

এজে', 'ল্যু ত্যু লে লিভ্‌র...' "দেহ দুঃখময় হায়, সব শাস্ত্র করেছি নিঃশেষ!" এই সব।

অমিয় একদিন একটা মজার কবিতা আবিষ্কার করল। নাম, "জানলা"—'ফনেত্‌র ফনেত্‌র ফনেত্‌র ফনেত্‌র/ফনেত্‌র ফনেত্‌র ফনেত্‌র ফনেত্‌র/' এরকমই চার লাইন। আমরা তো হেসেই কুটি-কুটি। আজ কিন্তু কবিতাটিকে মোটেই হাস্যকর লাগে না। রীতি-মতো ভালোই লাগে এই তৃপ্তিহীন বাতায়ন তৃষ্ণা।

যেমন বাবা মা। তেমনি সব বন্ধু, আর তেমনিই সব গুরু পেয়েছি বটে! আমার সৌভাগ্যের তালিকায় একটি প্রধান ঘটনা হলো কয়েকজন সত্যিকারের কবিকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়া। তেরো চোদ্দ বছর বয়সে শুদ্ধসত্ত্ব বসু আমাকে যত্ন করে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শেখান। তাঁরই উৎসাহে 'একক' পত্রিকায় আমার কবিতা বেরুত। তিনিই আমাকে শ্লোক রচনা করতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে জন্মদিনে ও বিয়ের তারিখে শ্লোকের পর শ্লোক লিখে আমি বাবা মা মামাপপুয়াকে ধন্য করে দিয়েছিলুম কয়েক বছর। এই শিক্ষা পরে নানাভাবে কাজে লেগেছে বাংলা কবিতা লেখায়।

বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, নরেশ গুহ, অলোকরঞ্জনের কাছে ইওরোপীয়, ইংরিজি ও বাংলা সাহিত্যের ক্লাস করেছি। একবার অমিয় চক্রবর্তীর কাছেও পড়েছিলুম আমেরিকায়।

কবিদের সঙ্গে চাকরি করি। নরেশদা, জগন্নাথবাবু, প্রণবেন্দু, মানবেন্দ্র। জন্ম থেকেই আমার নিয়তি আমাকে কবিদের আয়ত্তের মধ্যে রেখে দিয়েছে। ঘরে মা তো একাই দু'জন কবি, রাধারাণী, অপরাজিতা, আমি কবিতা লিখব এতে আর আমার কৃতিত্ব কিসের? কৃতিত্ব পরিবেশের।

আমার বন্ধুরা আমার কবিতা জীবনে খুবই জরুরি। বন্ধুদেরই উৎসাহে, মমতায় আমার কবিতা যেটুকু বাড়বার বেড়েছে। আমার প্রথম কবিতার বই (প্রথম প্রত্যয়, ১৯৫৯) বেরিয়েছিল অমিয়, প্রণবেন্দু আর আমার মেয়ের আগ্রহে। সুনীলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন', আলোকের 'আলোকিত সমন্বয়', মানবের 'একান্তর', প্রণবেন্দুর 'এক ঋতু', অলোকরঞ্জনের 'যৌবন বাউল' (এবং যতদূর মনে পড়ে 'ভিনদেশী ফুল') আর আমার 'প্রথম প্রত্যয়' পরপর বেরিয়ে পড়েছিল ১৯৫৭—১৯৫৯-এর মধ্যে। আনন্দর 'স্বগত সন্ধ্যা' বোধহয় তার কয়েক বছর আগে বেরোয়। তারাপদর 'তোমার প্রতিমা' দু' এক বছর পরে। ঠিক এক যুগ বাদে, বারো বছর পরে আমার দ্বিতীয় বই "স্বাগত দেবদূত" বেরুল ১৯৭১-এ। সেও প্রণবেন্দু অমিয়, মা এবং সুবীরের ঐকান্তিক ভালোবাসায়।

কবিতা প্রসঙ্গে আরও দুটি মানুষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা চিরদিনের। ইরা পড়ত আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে, আর রুমি ছিল পাড়ার বন্ধু। ইরা, বিষ্ণু দে-র বড় মেয়ে, রুমি বুদ্ধদেব বসুর ছোট মেয়ে। ইরাই আমাকে প্রথম শুনিয়েছিল নাইনথ সিমফনি আর পাসটোরাল (সিক্সথ) এবং কয়েকটি রেকর্ডে সম্পূর্ণ হ্যামলেটের আবৃত্তি। অসামান্য রেকর্ড সংগ্রহ বিষ্ণু দে-র। কিন্তু তাঁকে আমি খুব ভয় পেতুম, শুনেছিলুম তাঁদের সান্ধ্য আড্ডায় ভয়ানক সব ইনটেলেকচুয়াল আলোচনা হয়। ছোটদের প্রবেশের অনুমতি ছিল কিনা জানি না, আমি তো ভয়েই কখনো ঢুকতুম না ও ঘরে যখন আড্ডা চলতো। ইরাটা যেমন একগুঁয়ে গোঁয়ারগোবিন্দ তেমনি বন্ধুবৎসল। মাথায় কী ঢুকল, একদিন জোর করে আমার দুটো কবিতা ওর বেগুনী কালিতে নিজেই টুকে নিয়ে গেল বাবাকে দেখাবে

বলে। একেবারে ইচ্ছে ছিল না আমার। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্য বেশ প্রসিদ্ধি ছিল বিষ্ণু দে-র। আর আমার ধারণা, আমার ওল্ড ফ্যাশানের লেখা দেখে উনি নিশ্চয় খুব পরিহাস করবেন। কিন্তু কিছুই হলো না। বিজয় গর্বে নাচতে নাচতে ইরা এসে বলল—

—"দেখলি তো আমার বাবা কত ভাল লোক? তোরা শুধু শুধু ভয় করিস। একটা সাহিত্যপত্রে, অন্যটা উত্তরসূরীতে দিয়েছেন, কিছু কারেক্ট করতে হয়নি, আরো লেখা দিতে বলছেন।" এ কি সত্য? না মায়া? না বিষ্ণু দে-র মতিভ্রম? যাই হোক, ইরার গোঁয়ার্তুমির জন্যেই আমার কবিতা বিষ্ণু-দের চোখে পড়ল। আমি তো ধন্য। নিজের থেকে কখনো এতটা এলেম হত না আমার।

আর রুমির গল্পটা? এক রাত্রে আমার মা-বাবা কলকাতার বাইরে গেলেন সভা করতে। অমনি প্রতিভা মাসীমাকে ধরে বসলুম, আজকে রাত্তিরবেলা রুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে। মাসীমা স্বভাব-স্নেহময়ী, যা খুশি আবদার করা যেত ওঁর কাছে। মত দিয়ে দিলেন। আমরা তো হাতে চাঁদ পেলুম। সঙ্গে লাফাতে লাফাতে 'ফাউ' এল পাপ্পা। আমাদের পুরুষ প্রহরী। প্রহরীর বয়েস তখন বছর দশ-বারো হবে, এসেই তো তিনি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমরা কিন্তু ঘুমোতে গেলুম না। বৃষ্টি পড়ল রাত্রিভোর, আমরাও শূন্য বাড়িতে রাজত্ব করলুম সারারাত। প্রথমে তিনতলার শিকবিহীন জানলা দিয়ে আকাশে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছুঁলুম। অঞ্জলি ভরে অন্ধকার ছুঁলুম, ঘরের মেঝে ভেসে গেল জলে, খাট বিছানা ভিজে গেল বৃষ্টির ছাঁটে। অনেক নিচে পিচের রাস্তার চক্‌চকে ভিজে শরীরে রাস্তার আলোর জ্যামিতিক খেলা, বিশ্ব-প্রতিবিম্বের ম্যাজিক চোখ ভরে দেখলুম, কৈশোরের নানা স্বপ্ন-ইচ্ছের স্বীকারোক্তি হলো সন্তর্পণে,

প্রায় স্বগতোক্তির মতো। রক্তের উষ্ণতার মতো স্বাভাবিক সেই বন্ধুত্বের উষ্ণতা, শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার চূড়ান্ত, আমরা ছাদে গিয়ে ভোররাত্রের বৃষ্টিতে প্রাণভরে ভিজলুম। কখন এক সময়ে ওরই ফাঁকে রুমিকে দেখানো হয়ে গেছে আমার প্রাণভোমরার কৌটো, আমার কবিতার খাতা! রুমি তো যত অবাক তত খুশি। আমার কবিতা, হয়ত সেই রাত্রের নিজের গুণেই, ওর খুব ভালো লেগে গেলো। যাবার সময়ে রুমি খাতাটা চেয়ে নিল সকালবেলায়, আরো পড়বে বলে।

পরদিন বিকেলে "কবিতা-ভবনে" গিয়ে দেখি সর্বনাশ। বুদ্ধদেবের টেবিলে, তাঁর ওই রূপোর গেলাসের পাশেই শোভা পাচ্ছেন আমার শ্রীমান কবিতার খাতা! যাওয়ামাত্র বু ব হইহই করে উঠলেন—"আরে, বাঃ। তুমি এমন কবিতা লিখতে পারো, বলনি তো? এক্ষুনি বসে এই দুটো কবিতা কপি করে দাও। আজই প্রেসে যাচ্ছে।" দেখি কালো ডায়েরি থেকে দুটি পেজমার্ক উঁকি মারছে। আমার মনে হলো, স্বপ্ন দেখছি।

সেই প্রথম "কবিতা"য় লেখা বেরুলো। তারাপদর পাশাপাশি। তারও সেই প্রথম। রুমির, একমাত্র রুমিরই ভালোবাসার কৃতিত্বে। আমি কতদিনে পাঠাতে সাহস পেতুম কে জানে? "কবিতা" তখন কবিতার সফলতার শেষ ধাপে। এখন যেমন "দেশ"। সেই ঘটনাকে ঘিরে আরেকটি স্মরণীয় কথা বলতে হবে। ওই আনন্দের ফলশ্রুতিতে, ছোট্টো পাপ্পা আমাকে একটা সবুজ রেক্সিন বাঁধাই ডায়েরি উপহার দিল—"নবনীতাদিকে, কবিতা লিখবার জন্য।" সেই আমি জীবনে প্রথম কবিতা লেখবার জন্য খাতা উপহার পেলুম। সেই আনন্দ, বিস্ময় এখনও টাটকা আছে।

"দেশে" অবশ্য কবিতা বেরিয়েছিল এর আগেই। সেই প্রথম কবিতাটি বেছে দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। একদিন প্রেমেনকাকা এসেছেন, বাবা বললেন—"ওরে খুকু, তোর লেখাগুলো আজকাল সত্যি সত্যি কবিতা হচ্ছে, না ঘোড়াড্ডিম হচ্ছে, আমি তো কিচ্ছু বুঝি না। একবার প্রেমেনকে দেখা দিকি?" প্রেমেনকাকা খাতাটা নিয়ে গেলেন। খাতাটা যেদিন আনতে গেলুম, সেদিন 'কিনু গোয়ালার গলি'র লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ ছিলেন ওখানে। 'চলচ্চিত্ত' বলে একটা কবিতা প্রেমেনকাকার সব চেয়ে পছন্দ হলো। সন্তোষবাবুকেও দেখালেন। স্যাণ্ডো গেঞ্জী-লুঙ্গিপরা সুপুরুষ ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, ভালোই, দিয়ে দিক না 'দেশে'।" প্রেমেনকাকা যত্ন করে আরো অনেকগুলি কবিতা মনোনীত করে রেখেছিলেন ছাপার যোগ্য বলে, সেগুলি সবই 'পূর্বাশা' 'উত্তরা' 'একক' 'শতভিষা' ইত্যাদিতে একে একে বেরিয়ে গেছে। "দিয়ে দিক না 'দেশে'"—আমার মাথায় ঘুরতে লাগলো, দিলাম ডাকে পাঠিয়ে। "চলচ্চিত্ত" নাম মার দেওয়া। আমি নাম দিয়েছিলাম "রাতের রেলগাড়ি"। তখন বয়েস ষোল। অন্ত্য মিল ছিল না, রেলগাড়ির গতিটা ছন্দে, আর রাত্রির মুডটা চিত্রকল্পে ধরবার চেষ্টা ছিল কবিতাটায়। মায়ের নতুন নামকরণে কবিতাটি এক ঝলকেই একদম পালটে, অনেক গভীর অর্থবহ, মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। লিরিক কবিতায় নামকরণ খুব জরুরি।

আজ প্রেমেনকাকার চোখ গেছে, অথচ কত যত্ন করেই না পড়েছিলেন আমার সেইসব কাঁচা লেখা। আমার মধ্যে প্রাথমিক আত্মপ্রত্যয় এনে দেন তিনিই, ওগুলো যে "ঘোড়াড্ডিম" হচ্ছে না, তা কি আমিই জানতুম আগে?

একটা বড়ো ঘটনা ঘটলো। আমার "চলচ্চিত্ত" মনোনীত হয়েছে, নীল পোস্টকার্ড এলো 'দেশ' পত্রিকা থেকে। তখন কবিতা মনোনয়ন করতেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 'নীল নির্জন'—'এই তো নেমেছে রাত্রি মনের নীল নির্জনপ্রান্তে'। মলাটে নাম, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সব্বাইকে সেই পোস্টকার্ড দেখিয়ে বেড়ালুম কলেজে। এবার থেকে আমিও তাহলে প্রায় শিশির দাশ! কলেজে 'দেশ'-বন্দিত কবি! সে কী উল্লাস! শিশিরের সঙ্গেই পড়ত শক্তি। অথচ তাকে তখন আমরা চিনতুম না। সে মদও খেত না কবিতাও লিখত না। পড়াশুনো করত। শক্তি যখন লিখতে শুরু করে, আমি তখন দূর বিদেশে দ্বীপান্তরী। হঠাৎ একদিন দেখলুম, শক্তি তখন জাজ্বলন্ত—"অই কপালে কী পরেছো?"

॥ ৩ ॥

কবিতাকেই জীবন বলে বিশ্বাস করতেন এমন দুজন সাহিত্য-সমর্পিত-প্রাণ মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। দুজনে দুই যুগের, দুই ধরনের, দুই গড়নের মানুষ, কিন্তু এক জায়গায় তাঁরা এক। সাহিত্যের বাইরে তাঁরা অসহায়। এঁদের স্বগৃহে কোনো সাংসারিক অস্তিত্ব ছিল না—সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কেটে যেত লেখার টেবিলে, আর বৈঠকখানায়, সাহিত্যের আলোচনায়। শুধু কবিতার জন্য এই যে বেঁচে থাকা, এর ফলে দু'জনের মধ্যেই ছিল অমিত তারুণ্য, বিষয়বিমুখ, সারল্য আর শাশ্বত বিশ্বাস। এঁদের যে এই

নিদায় চিরকৈশোর—তার দায়িত্ব অবশ্যই এঁদের স্ত্রীদের পাওনা। সব দায়ভার নিজেরা নিয়ে স্বামীদের এঁরা ছুটি দিয়েছিলেন—অথচ নিজেরাও ছিলেন সাহিত্যিকই। বাবা এবং বু ব-কে চোখে দেখাই ছিল আমার পক্ষে ঢের শেখা। প্রতিভা বসু এবং আশাপূর্ণা পিসিমাকে দেখে শেখা উচিত ছিল—কীভাবে সংসার আর সাহিত্য একসঙ্গে চালানো যায়। মা অবশ্য সংসারের চাপে শেষটা সাহিত্য ছেড়েছিলেন।

বাংলা কবিতার পঞ্চাশ বছরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো ষোলো সতেরো বছর বয়সের মধ্যেই দুটি আশ্চর্য গৃহের কল্যাণে। 'ভালোবাসা' আর 'কবিতা-ভবন' আমাকে যে-সুযোগ এনে দিয়েছিল, দুর্ভাগা আমি তার কিছুই কাজে লাগাতে পারিনি। মা-বাবার কাছে আসতেন প্রমথ চৌধুরী, প্রিয়ম্বদা দেবী, নজরুল, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, যতীন বাগচী থেকে অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, অজিত, বুদ্ধদেব, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষদা, অমিতাভ চৌধুরী, অরবিন্দ গুহ, আনন্দ বাগচী, শরৎ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন পর্যন্ত। গদ্য লেখকদের কথা এখানে বলছি না। আর বাদবাকীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে "কবিতা-ভবনে"—সুধীন্দ্রনাথ, অরুণ সরকার, নরেশ গুহ, তারাপদ, প্রণবেন্দু, দীপক, জ্যোতি। শঙ্কুর (অজিত দত্তর মেজ ছেলে) কাছেই দীপক, প্রণবেন্দুকে প্রথম দেখি। তখন দীপক, অলোকরঞ্জন, আনন্দ বাগচী, অরবিন্দ গুহ তরুণতমদের মধ্যে প্রধান। শঙ্খদার, সুনীলের, আলোকের, কবিতাদির লেখাও খুব চোখে পড়ছে। এক একটা লাইনেই হুলুস্থুলু পড়ে যেত তখন—"উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উন্‌তিরিশে এসে / ··· এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সুচতুর গোপন প্রেমিক" বা "বোবা দেয়ালটা, শাদা দেয়ালটা / হঠাৎ লালচে / রঙ্গনটিনী ভ্রমরার কাছে /

আদর কাড়ছে।" "আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে", সুনীলচন্দ্র সরকারের "আয় চলে এই জামতলায় / দূর থেকে ছ্যাখ্ বাড়িটা তোর এদিকে জানলা ওদিকে দোর" ইত্যাদি রাতের ঘুম কেড়ে নিত। এখন কবিতার বাজার মন্দা। ভাল কবিতা এখনও যথেষ্টই লেখা হয়। কিন্তু হুলুস্থুল পড়ে না। সেই উতল ভালবাসাটা মরে গেছে?

বাবা শিখিয়েছিলেন পদ্য রচনা। উত্তম মিল, অধম মিল, মধ্যম মিল। পয়ার, ত্রিপদী, মন্দাক্রান্তা। যমক, অনুপ্রাস। সিমিলি মেটাফর। "পাঠশালা" পত্রিকার উৎসাহী গ্রাহকদের বাবা হাতে করে পদ্য লেখা শেখাতেন। দেখতে দেখতে আমিও শিখে গিয়েছিলুম। ইদানীং অবশ্য অধম মিলটাকে আমার উত্তম মনে হয়! বাবা ছবিও আঁকতেন খুব সুন্দর। চাইনীজ ইংকে আর লাল কালিতে সরু নিবের সরু কলমে বাবা সুন্দর স্কেচ করতেন। আমাকে ছবিতে-ছড়াতে মিলিয়ে রঙিন চিঠি লিখতেন বাবা, দূরে কোথাও গেলেই। আমি যে ছবি আঁকি, সেও বাবারই জন্যে। অথচ বাবার ছবি আঁকার খবর কেউই জানে না। মা শিখিয়েছিলেন সনেট লিখতে। তখন মার প্রিয় ফর্ম ছিল চতুর্দশ মাত্রার চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির, অন্ত্যমিল সমেত কবিতা। কখ খক-কখ খক ঠিক থাকবে, বাকীটা যেমন খুশি।—"কবিতা খুব আঁটোসাঁটো হবে, মিনিমামটুকু লিখবে, বেশিটাই থাকবে উহ্য," মা বলেছিলেন, "কবিতা বক্তৃতা নয়, ব্যঞ্জনা।"

আর মায়ের অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে লেখা কবিতা পড়ে আরেকটা জিনিস শিখেছি, লঘুস্বরে গভীর কথা বলা। এটা কেবল শিল্পেরই শিক্ষা নয়, জীবনের সম্বল। জীবনের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত মা আমার কবিতার আগ্রহীতম পাঠক। এখনও কিছু লিখলে মাকে আগে দেখাই। মনে পড়ে সাত বছর বয়সে যখন প্রথম আমার

লেখা ছাপার হরফে বেরুলো গোখেল ইস্কুলের ম্যাগাজিন "সাধনা"য়, একসঙ্গে দুটো কবিতা, একটা গদ্য। বাংলা কবিতাটি খনার বচনের মতো, নাম চিনি ও নুন, ইংরিজি কবিতাটি ব্যাং বিষয়ক, নাম ফ্রগ, গদ্যটি কালবৈশাখীর বর্ণনা। মার সেই আনন্দ আমি ভুলিনি এখনও। ছন্দ মিল নির্ভুল হলে কি হবে, দুটি কবিতার একটিতেও কিন্তু কবিত্বের লক্ষণ ছিল না। (ছিল বরং গদ্যটিতে !)।

জীবনে প্রথম ছাপার অক্ষরে আবির্ভাব যদিও দ্বিভাষী লেখক হয়ে, এবং গদ্য পদ্য দুই মাধ্যমে, তবু কবিতাই আমার প্রথম। আর ইংরিজিতে কবিতা লেখার কথা ভাবতেই পারি না। যখন বছরের পর বছর পরের দেশে বিলেতে মার্কিনে পড়ে থেকেছি, তখন অবশ্য লিখেছি। কি করব, যে ভাষাটা হাটেবাজারে বাসে-ট্রেনে সর্বদা কানে আসে সেটাই হয়ে যায় কলমের ভাষা। তাই কলকাতায় বসে ইংরিজিতে লেখা অচিন্তনীয় হলেও লণ্ডনে কি বার্কলেতে মোটেও তা নয়। সেখানে ওটাই প্রাথমিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার ভাষা। জীবন-যাপনের ভাষা যখন যা, প্রকাশেরই বা মাধ্যম সেটা হবে না কেন ? তাই তো স্বাভাবিক।

কবির মেয়ে বলে একটা জ্বালা পোহাতে হয়েছে সারা জীবন। খুব ছোটবেলায় ত্রিকোণ পার্কের "অগ্রগামী" ক্লাবের স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের "নদী" কবিতার ভাব, আর সত্যেন্দ্র-নাথের ঝরনা কবিতার ছন্দ মিলিয়ে বানানো আমার "নদী" কবিতাটি পুরস্কৃত হলো। পুরস্কার দিতে গিয়ে কবি সুনির্মল বসু কানে কানে বললেন—"কি রে বাবা লিখে দেননি তো ?" ঠাট্টা, কিন্তু রটে গেল "নবনীতার সব কবিতা ওর বাবাই লিখে দেন।" "ভারতবর্ষে" যখন ব্র্যাকেটে (১২) বলে কবিতা বেরুল, স্কুলে পাড়ায় সব বন্ধুরা বলল

"কে না জানে, ওর বাবা লিখে দিয়েছেন ?" ('ইনগ্রিড, আমি পেয়েছি তোমার পত্র চারু।') চোদ্দ বছর বয়েসে ব্রেবর্নে আরেকবার পুরস্কৃত হলুম, ম্যাগাজিনের প্রথম পাতায় কবিতা ছাপা হলো। আরতি বলল : "অধ্যাপিকারা বলছেন কবিতাটায় তোর মায়ের হাতের ছন্দ ঝংকারটি বড্ড স্পষ্ট রে।" ('ইলিনরা, ভুলি নাই তোমাকে, তোমার ইতালিকে !') ভাগ্যিস কবিতাটা শেষ দিনে ক্লাসের মধ্যে বসে লেখা, টুনু, আলো, সুমিতার সামনে ! টুনু আর আলোও কবিতা লিখতো। ঠা ঠা রোদের মধ্যেও মাঠে বসে আমরা পরস্পরের কবিতা পড়তুম। যত্রতত্র মাতালের মতো সুরে-বেসুরে তালে-বেতালে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতুম। অচেনা গাছকে ভালো লাগলে নিজেরা খুশি মতন একটা নামকরণ করতুম তার, গাছটা সেই থেকে আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যেত। সেসব দিনে আমাদের কাছে একমাত্র সর্বময় সত্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই যথেষ্ট ছিলেন। আমাদের সমস্ত কবিতাতৃষ্ণা মিটিয়ে তিনি উপচে পড়তেন আমাদের অস্তিত্ব ছাপিয়ে। রবীন্দ্র-নাথকে উত্তরণ করে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি প্রেসিডেন্সি কলেজে যাবার আগে।

॥ ৪ ॥

প্রেসিডেন্সিতে গিয়ে দেখি ছেলেরা অনেক এগিয়ে। অর্জুন সমর সেনের কবিতা নিয়ে প্রবন্ধ লেখে, অরুণাভ সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের মডেলে প্যারডি লেখে। এক ক্লাশ উঁচুতে শিশির দাশ জীবন-মৃত্যু

নিয়ে দার্শনিক কবিতা লেখেন 'দেশে'।

এক বিপুল বিস্ময়ের জগৎ খুলে যায় চোখের সামনে। ক্লাসে বসে পরিচিত হচ্ছি ইংরিজি সাহিত্যের রসভাণ্ডারের সঙ্গে। শেক্সপীয়ার, মার্লো, ব্লেক, ডান, কীটস্, কোলরিজ। আর ক্লাসের বাইরে এলেই দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি—কত কী যে বলে ছেলেরা! কত জানে তারা। যা বুঝছি, সমর সেন, সুকান্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এঁরাই হলেন রাজারাজড়া। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ এঁরা অবক্ষয়ের কবি। আর রবীন্দ্রনাথ যত নষ্টের গোড়া। যত শুনি তত মাথা ঘুরে যায়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তো কিছুই পড়িনি। না প্রগতি, না অবক্ষয়!

এই সময়ে একটি ছেলে আমাকে প্রায়ই কবিতা শোনাতো। "একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চূড়ে / ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী। একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণি জুড়ে / থামিলো কালের চিরচঞ্চল গতি…" "সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো না ক তুমি! বোলো না ক কথা অই যুবকের সাথে!" "মাঝে মাঝে মনে হয় দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে / তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি।" …"রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও / আমার বৈশাখী রাত্রিদিন", "চাই না তুমি বিনা শান্তিও" …"অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে"… "ও' দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের পাব কি পরশ যৎসামান্য?" —এতদূর খুব মনের মতো। খুব ভালো। কিন্তু তারপরেই যেন জিজ্ঞেস করতো— "বলো তো এই লাইনটা কার?" অমনি সব বিষ হয়ে যেতো। আমি কি ছাই জানি? আমি কি কিছু পড়েছি ওসব? কাণ্ড দেখে সে-ছেলে তাজ্জব হয়ে গেল! সিগনেটের সঙ্গে তার চেনাশুনো ছিল। ফলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। শুরু হলো আমার কবিতার বই

উপহার পাবার পালা। সিগনেটের সেই সব অপূর্ব মলাট, আশ্চর্য ছাপা বাঁধাই কাগজ, আঠার গন্ধটা পর্যন্ত নেশার মতো ভালো লাগতো। জীবনানন্দ। সুধীন্দ্রনাথ। অমিয় চক্রবর্তী।

সে ছেলেটি অনেকদিন হলো অন্যদের কবিতা শোনাতে চলে গেছে। কিন্তু আমাকে ভেঙেচুরে নতুন ক'রে গড়ে দিয়ে গেল সেই সব কৃশকায় অত্যাশ্চর্য বই। বুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে নতুন রক্তের বীজ, শিরায় বইতে শুরু করেছে রবীন্দ্রোত্তর যুগ। কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায় / কেমন করে বলি! এতদিনে আবিষ্কার করলুম অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে, যে বাবার বিপুল কবিতা-গ্রন্থাগারে প্রত্যেকটি বই ছিল, এক সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া। শুরু হলো অচিন্ত্য বুদ্ধদেব অজিত প্রেমেন্দ্র জীবনানন্দ বিষ্ণু দে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে আক্ষরিক পরিচয়ের গোপন উদ্দাম পর্ব। কী অবিশ্বাস্য সেই সব দিন! প্রতিটি দিন নতুন বিস্ময়ে, নতুন আবিষ্কারের স্পর্শমণিতে ভরা।

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" তখন সদ্য বেরিয়েছে। সেই সময়ে রোজই "কবিতা ভবনে" যাই। শঙ্কুর কাছে, রুমির কাছে। দীপক, প্রণবেন্দু, তারাপদ, মিমি জ্যোতির সঙ্গে দেখা হয়। সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, নিরুপম, অশোকদা, নরেশদা, অরুণ সরকারদের আলোচনা শুনি। কিছুকাল পরে ওখানেই পর্দার পেছন থেকে সসম্ভ্রমে প্রথম দেখি 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে। বু ব-র সান্ধ্য বৈঠকের এক কোণে চুপচাপ বসে থাকি কান পেতে। ঝরনা তলায় কলস পূর্ণ হয়। রোজ নতুন উদ্দীপনায় তেজীয়ান হয়ে বাড়ি ফিরি। অমূল্য কত আলোচনা শুনি, কবিদের নাম, শিল্পীদের নাম। পরে বু ব-র কাছে ধার করে সেই সব কবিদের কবিতা পড়ি। রিল্‌কে,

বদলেয়ার, মালার্মে···খুলে যাচ্ছে ইওরোপীয় কবিতার সিংদরোজা।

এম-এ-তে তুলনামূলক সাহিত্য পড়তে ভর্তি হয়েছিলুম এই সব আলোচনা শোনারই ফলে! বু ব-র কাছেই শিখেছিলুম যে পদ্য মাত্রই নয় কবিতা, আর গদ্যে যথেষ্ট খাঁটি কবিতার ভেজাল থাকে। উনিই আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন কবিতা কাকে বলে, আর শিখিয়েছিলেন কবিতাকে ভালোবাসতে।

যেদিন কবিতাদি, শক্তি, আর সুনীলের সঙ্গে দেখা হলো, সেই-দিনই আমি জীবনে প্রথম কফি হাউসে গিয়েছি। দরজার কাছে দৃপ্ত সুন্দরী একটি তেজী মেয়ে এসে দাঁড়ালো। প্রণবেন্দু বলে দিল "ওই যে কবিতা সিংহ।" কে যেন বলল, "ওর কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে, বিমল রায়চৌধুরীর সঙ্গে।" কবিতাদিকে দেখে আমি মুগ্ধ। আরো মুগ্ধ, যে রায়চৌধুরীর বউ সিংহ হয়। হতে পারে!

দুটি ছেলে এসে টেবিলে বসলো। দীপক আলাপ করিয়ে দিল—শক্তি, সুনীল। আমার তখন দুই হাতের মুঠো ভর্তি কফি হাউসের চিনি। হাতেরা আমার তো শান্ত থাকে না, বেজায় ছটফটে, সারাক্ষণ কিছু না কিছু করছেই। কী করে নমস্কার করি? চিনিটা আগে সুনীলেরই অঞ্জলিতে অর্পণ করে, হাত খালি করে নিয়ে সুনীল-শক্তিকে নমস্কার করলুম। সুনীল বেচারা কিন্তু তখন প্রতি-নমস্কার করতে পারছে না। তার তো হাত জোড়া তখন চিনিতে? এ নিয়ে কবিতাদি, সুনীল এখনো আমাকে খ্যাপায়। দীপক সেদিন অনেক গান করেছিল কফি হাউস ফাটিয়ে। মনে হয় যেন এই সেদিন!

একই সঙ্গে অনেক বিচিত্র বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছিলুম তখন। জীবনের সবচেয়ে দামী আমার ওই দিনগুলো। বিষ্ণু দে-র বাড়িতে যেমন পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের স্বাদ পেলুম, "কবিতা ভবনে" তেমনি পরিচয়

হলো পাশ্চাত্ত্য শিল্পের সঙ্গে। যদিও ছেলেবেলায় বাবা মার সঙ্গে ইওরোপের প্রসিদ্ধ সব যাদুঘরে ঘুরে বেড়িয়েছি, দেখেছি 'লাস্ট সাপার', 'মোনালিসা', দেখেছি 'জুপিটার', 'পিয়েতা' কি 'সূর্যমুখী', 'চেয়ার'— ইত্যাদি। কিন্তু সে-দেখা দেখাই শুধু, চেনা নয়। এতদিনে চেনা হলো—ভ্যান গখ্, গগ্যাঁ, পিকাসো, মাতিস, শাগাল, মিরোর সঙ্গে। ছোট্ট পাপ্পাটা তখনই ছবি দেখেই বলে দিত—'এটা তো শাগাল্' 'এটা মাতিস!' আমি অবাক হয়ে যেতুম—আধুনিক বাংলা কবিতা, আধুনিক ইওরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে এই যে পশ্চিমের সঙ্গীত ও আধুনিক শিল্পের সঙ্গে পরিচয় হলো, এও আমার কবিতা-লেখার কবিতা-বোঝার মনের পক্ষে একটি অত্যন্ত জরুরী অভিজ্ঞতা।

তা বলে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িনি। তখন জীবনে সবাই এসে পৌঁছেছেন, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ নক্ষত্রেরা সব,—কিন্তু সেই সৌরমণ্ডলে, সেই ইন্দ্র সভার সভাপতি ছিলেন বুকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ।

এমনি করে একদিন বড়ো হয়ে গেলুম আমরা। প্রথম কবিতার বই, প্রথম এম এ ডিগ্রি, প্রথম মা বাবাকে ছেড়ে বিদেশে পড়তে যাওয়া, প্রায় একসঙ্গেই ঘটল। তার পরেই বিবাহ।

তারপর? তেরো-চোদ্দ বছর ঘূর্ণি বাতাসে লাট খেয়ে বেড়িয়েছি, দেশে বিদেশে। পড়াশুনো। যাবাবর হাঁসেদের মতো বাসা বেঁধেছি। মা হয়েছি। পৌঁছে গেলুম নতুন এক বৃত্তে। কিন্তু এই নতুন জগতেও দু তিনজন ছিলেন পুরোনো, যাঁরা আমার কবিতার খোঁজ করতেন, লিখতে তাগাদা দিতেন। অগ্রজপ্রতিম অশোক মিত্র, তপন রায়-চৌধুরী, অশোক রুদ্র। বাল্য সখী যশোধরা। এঁরা আমাকে কবিতার কথা ভুলতে দেননি। প্রণবেন্দুও চিঠি লিখে তাগাদা লাগাত 'কবিতা

লিখছ ?' কলকাতায় এলে, তারাপদ, সুনীল 'কৃত্তিবাসে'র জন্য তাড়া দিত।

কিন্তু জীবনের উচ্ছ্বাসে কবিতা ভেসে গিয়েছিল! লিখতুম না তা নয়, কিন্তু খুব অল্প। সেজন্য দুঃখ ছিল কি ? ছিল না। "একটা জীবন ভাঙতে ভাঙতে অন্য জীবন গড়ছি না কি ?" এতই নেমকহারাম আমি যে, জীবন আর কবিতার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে প্রত্যেক-বারই বলব—"জীবন চাই"। যদিও বেশ জানি জীবন বিশ্বাসঘাতক, শেষ আশ্রয় কবিতাই। কবিতা ঠকায় না। জোয়ার ভাঁটার শাসন না মেনে জীবন যখন উদ্দাম জলস্তম্ভ হয়ে আমাকে তলিয়ে দিতে এসেছে, তখন তো ছুটে গেছি কবিতারই দালান-কোঠায়। আশ্রয় পেয়েছি। বেঁচে গেছি।

কিন্তু ভিতরে অনেক কিছু অদল বদল হয়ে গেছে। লুকোবো আর কী! কবিতা তো দর্পণ, কবিতা তো সবই ফাঁস করে দেয়। শিরায় শিরায় গ্রন্থি মোচনের সাংঘাতিক একটা পালা ঘটে গেছে। আজন্মের কিছু অভ্যাস পালটে গেছে। যেমন, কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল খাতাতে। আর কবিতার খাতাগুলি ছিল আমার প্রাণাধিক। একটিও কবিতা যেন হারিয়ে না যায়।

এখন লিখি যে কোনো টুকরো কাগজে। বিলের পিছনে, মেয়েদের স্কুলের খাতার মলাটে, ছেঁড়া খামের গায়ে। লিখি, পড়ে থাকে, উড়ে যায়, হারিয়ে যায়, খুঁজে পাই না, ভুলে যাই। খাতা নেই। বাক্স নেই। দেরাজ নেই। কবিতার জন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গাই নেই। ভাবলে হাসি পায় কেমন করে বেনে বউদের গয়নার বাক্সের মতো সযত্নে সামলে রাখতুম সেই হলদে প্যাকেটটা, যার ভেতরে ছিল ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত লেখা সব কবিতার খাতা। বেশি না, চার

পাঁচটা খাতা। বেশি কবিতা কোনোদিনই লিখি না। দু' চার দিনের জন্যেও কোথাও গেলে—এমনকি বাপের-বাড়ি শ্বশুর-বাড়ি যাতায়াতের সময়েও—সেই হলদে প্যাকেট আমার সঙ্গে সঙ্গে যেত। কৈশোর যৌবনের মহার্ঘতম মুহূর্তগুলি তার মধ্যে বন্দী যে! হারালেই সব গেল!

আর এখন? সে প্যাকেট এখন কোথায় আছে, কোথাও আছে কিনা, তা সুদ্ধ জানি না।

'প্রাণাধিক' বলে কোনো শব্দই নশ্বরদের অভিধানে থাকা উচিত নয়।

॥ ৬ ॥

আমার কোনো কাব্যাদর্শ নেই। প্রণবেন্দুর যেমন ছিল, রিল্‌কে। প্রণবেন্দু বলত কবিতার দ্বারা মহৎ কিছু সাধিত হয়। কবিরাই মানুষকে, জগৎকে উদ্ধার করতে পারে। বলত, শিল্প জীবনের চেয়ে বড়ো। আমি তখন স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ইউনিয়ন করি। প্রণবেন্দুর কথাগুলোর মানে বুঝতে পারতুম না। কিন্তু মন দিয়ে শুনতুম। প্রণবেন্দুর কাব্যভাবনা ছিল, দীপকেরও ছিল, আমার ছিল না।—'কাব্য ভাবুকেরা কাব্য নিয়ে ভাবুক, আমি বরং ততক্ষণে আর দু' খানা কবিতা লিখে ফেলি!" এই হলো মূলত আমার একমাত্র কাব্যভাবনা। কিন্তু যখন কবিতা লিখতে পারি না, কিছুতেই লেখা হয় না, ছটফট করি। তখনই কাব্য নিয়ে ভাবনায় পড়ি। (সেটাকে

কি 'কাব্যভাবনা' বলা যাবে ?) বু ব বলেছিলেন, "যখন এরকম হবে, তখন অন্যদের কবিতা অনুবাদ করতে হয় নিজের ভাষায়। তাহলেই কবিতা আবার আপনি ফিরে আসবে।" কিন্তু যখন খরা উপস্থিত হয়, তখন বু ব'র ওই দামী উপদেশটাও মনে পড়ে না। কর্ণের রথের চাকা যখন বসে গিয়েছিল, তখন কি তাঁর সূর্যমন্ত্র মনে পড়েছিল ?

অতএব, কাব্যভাবনা না থাক, আমার কাব্য-দুর্ভাবনা ঢের আছে। নানান জাতের। হাংরি জেনারেশনের সময়ে যেমন এক রকমের দুর্ভাবনা জেগেছিল। এই যে এত লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেরোয়, এতে আরেক রকমের দুর্ভাবনা হয়। মা একবার বলেছিলেন : "সরকার থেকে এবার কবিতা নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করা উচিত—দেশে পোয়েট্রি এক্সপ্লোশন ঘটেছে।" সত্যি কথাই। অনেকের ধারণা হয়েছে আধুনিক কবিতা মানে যা খুশী তাই। মিল চাই না বলে ছন্দও চাই না। চিত্রকল্পও চাই না, ব্যাকরণ চাই না, শিল্প চাই না, রুচি চাই না, সূক্ষ্মতা চাই না, শক্তি চাই না, সাধনা চাই না। চাই কেবল অহং আর ভড়ং। এমনি করলে কবিতার মানহানি হবে না ? মূল্য হ্রাস ঘটবে না ? হয়েওছে। যখন কোনো কোনো ছোটো পত্রিকার তরুণ সম্পাদক বলে ফেলেন —"তা, গদ্য যদি নাই দিতে পারেন তবে কবিতা-টবিতা যা হোক একটা কিছু দিয়ে দিন ?" তখন আমার সত্যি সত্যি কান্না পায়। ওরা কি জানে না "কবিতা-টবিতা-যা হোক" বলতে নেই ? ওরকম বললে মা সরস্বতী বিরূপ হন ? ওরা কি জানে না একটি কবিতা লিখতে কতো কষ্ট ?

ভাষা তো সংকেত, ভাষা তো এক বুনো ঘোড়া। তাকে পোষ মানিয়ে, জ্বলন্ত আগুনের রিংয়ের মধ্য দিয়ে বাজনার তালে তালে লাফ দেওয়ানোর নাম কবিতা। এ কি সোজা কাজ ?

কবিতা মানেই যুদ্ধ। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে যখন বিজয় এবং শান্তি, মাত্র তখনই প্রস্তুত হয় কবিতা। বুকের মধ্যে গুহায়িত হয়ে থাকে সেই কবিতা, প্রায় সে প্রজ্ঞার স্বগোত্র সেখানে। কিন্তু প্রজ্ঞাকে জীবন গুটি পাকিয়ে অনেক সময়ে আমাদের আঁচলে ছুঁড়েও দেয়। কবিতাকে? নৈব নৈব চ। কবিতা তোমার শমী বৃক্ষ থেকে আনা অস্ত্রের পরীক্ষা নেয়। কবিতাকে অর্জন করে নিতে হয়।

—"অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে।" সেই বিপন্ন বিস্ময়ের যদি প্রকাশ ঘটানো যায় কবিতায়, একমাত্র তাহলেই সেই ক্লান্তিকর ক্লান্তির কবল থেকে মুক্তি মিলতে পারে। তরুণ সম্পাদক, তোমরা কি একথা জানতে পারোনি?

আরেক কবিতা-দুর্ভাবনা হলো কবি সম্মেলন। নিজের কবিতা নিজে নিজে পড়ে অন্যকে শোনানো আমার দ্বারা হয় না। বন্ধুদের আমি কবিতা হাতে দিয়ে বলি পড়ে নিতে। কবি সম্মেলনে গেলে সেই অসম সাহসিক অপকর্মটি করতে হয়। তারাপদ দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ে না, ওর হাঁটুতে হাঁটুতে ঠুকে যায়। মাইকে মনে হয় ড্রাম বাজছে। আমার ড্রামটা বাজে বুকের মধ্যে। জিব জড়িয়ে যায়। গলা শুকিয়ে যায়। ফলে, মাইকে যা চতুর্গুণিত হয়ে সম্প্রচারিত হয়, তা প্রধানত আমার হাঁপানির টান। আর তার ফাঁকে ফাঁকে দু'চার টুকরো ভীরু কবিতা হাঁসফাঁস করে ঢুকে পড়ে। কবি সম্মেলনের নামেই আমার পায়ের ভিতরে পা, ফুটপাথ বদল হয় মধ্য দিনে।

কবিদের মোটামুটি পাঁচটা জনসংযোগ মাধ্যম আছে, বড় কাগজ, ছোট কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন, সভামঞ্চ। সবচেয়ে নিরাপদ প্রথম দুটি। রেডিওটা মন্দের ভালো, গলাটুকু শোনা গেলেও, কবিকে তো

দেখা দিতে হচ্ছে না। টি. ভি.-টা তার চেয়েও খারাপ, কানেও শুনতে পাচ্ছে, চোখেও দেখা যাচ্ছে, আব্রু টাব্রু আর থাকে না। তবে কবি নিজে তো আর দর্শকদের দেখতে পাচ্ছে না? তার চক্ষুলজ্জাটা বাঁচে। সবচেয়ে মন্দ ব্যবস্থা সভামঞ্চ। কবি সম্মেলন। সেখানে কোনো আড়ালই নেই। সবাই সবাইকে দেখে ফেলছে, যেন সম্মুখ সমর। কবিতায় একটু আড়াল ভালো। দস্তানা পরে হ্যাণ্ডশেক।

এর পরে একটা বিশেষ দুর্ভাবনার কথা বলি। মেয়ে হয়ে কবিতা লেখার একটা মুশকিল হলো 'মহিলা কবি' বনে যাওয়া। কবিতাদি এই শব্দটিতে প্রচুর প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু ধারণাটি পাঠকচিত্তে বদ্ধমূল। ওটা ওপ্‌ড়াবে কার সাধ্যি? সবাই জানেন যে কবিতাটি ভাল কি মন্দ তার সঙ্গে কবিটি মেয়ে না পুরুষ, রোগা না মোটা এ প্রসঙ্গের কোনো যুক্তিসঙ্গত যোগ নেই। কিন্তু কিছু কিছু বিভ্রান্ত পাঠক কবিতা ব্যাপারটাতে মন না দিয়ে মহিলা ব্যাপারটাতেই বেশি মনোনিবেশ করে ফেলেন। যার ফলে আমাকে অনেকবারই শুনতে হয়েছে: "নবনীতা, এ সপ্তাহের 'দেশে' তোমার কবিতাটি বড়ো ভালো লাগলো!" আমাকে তখন সবিনয়ে জানাতে হয়েছে— "এবারের 'দেশে' তো? ঐ কবিতাটি অবশ্য বিজয়া লিখেছে। ধন্যবাদ।" অথবা—"হ্যাঁ ওটা আমারো খুবই ভাল লাগল, ওটা আসলে কবিতাদির লেখা।"—অথবা দেবারতির। অথবা রাজলক্ষ্মী দেবীর। এসে যায় না কিছু। মেয়েদের লেখা তো? সব চীনেম্যানকে যেমন একরকম দেখতে, সব মেয়ে কবিদেরই তেমনি একরকম লেখা।

অথচ কথাটা কী হাস্যকর! আমি যখন লিখতে শুরু করেছিলুম তখন "আধুনিক কবিতা" লিখতেন মাত্র তিনজন মেয়ে—রাজলক্ষ্মী দেবী, হেনা হালদার ও কবিতা সিংহ। প্রত্যেকে আলাদা। আমি

যখন লিখছি, তখন আরেকটি মেয়েও কিছুদিন লিখেছিল, শিপ্রা ঘোষ। শিপ্রাকে আর লিখতে দেখি না। হেনা হালদারও খুব অল্প লেখেন। ষাটের দশকে লিখতে শুরু করেছে বিজয়া (আমার সঙ্গেই পড়ত, তখন কবিতা লিখত না, কবিতার মত চিঠি লিখত) আর অনুজা দেবারতি। দু'জনেই শক্তিসম্পন্ন শিল্পী। আর প্রত্যেকেরই কলম আলাদা ধাতের। রাজলক্ষ্মী হেনার মত না। হেনা কবিতার মত না। কবিতা নবনীতার মত না, নবনীতা বিজয়ার মত না। ঠিক যেমন শঙ্খ সুনীলের মত না, সুনীল অলোকরঞ্জনের মতো না, অলোক শক্তির মতো না, শক্তি প্রণবেন্দুর মতো না, প্রণবেন্দু তারাপদর মতো না। এই ব্যাপারটা সত্যিই কবিতা-দুর্ভাবনার। হে প্রিয় বিভ্রান্ত পাঠক, আলাদা করে আমাদের চিনে নিন। আমাদের মুখগুলো ভালো করে দেখে রাখুন। কবিতার প্রত্যেকটি লাইনেই কবির পাসপোর্ট সাইজ ফোটোগ্রাফ আঁটা থাকে।

॥ ৭ ॥

নিজের কবিতার বিবর্তন ? নিজের কবিতার চরিত্র ? এসব কথার উত্তর আমি কি জানি ? আমার জীবন যেমনভাবে পাড় ভাঙতে ভাঙতে চলেছে, কবিতাও তেমনি পাড় গড়তে গড়তে এগোচ্ছে। হঠাৎ হয়ত একটা লাইন মনে চলে আসে, কিংবা পরপর কয়েকটা লাইন। কখনো বা ছন্দটাই আগে থেকে মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। এর কি কোনো নিয়মকানুন আছে ? "এতদিন 'ক' স্টাইলে লিখেছি

এইবার বরং 'খ' স্টাইলে লেখা যাক"—এ জাতীয় সুবুদ্ধি আমার মগজে কদাচ আসে না। হরেক রকমের কবিতা লিখি আমি, কিন্তু যখন যেটা লেখার, তা কলমই ঠিক করে দেয়। আমার কবিতায় যা যা পরিবর্তন এসেছে তা বর্ষার পরে যেমন শরৎ আসে, শীতের পরে বসন্ত, ঠিক তেমনই স্বচ্ছন্দ।

আর প্রভাব? কখন কীভাবে কার প্রভাব পড়ে লেখায় কেউ কি তা নিজে বলতে পারে? সেই যে আমি 'বেড়াল' কবিতা লিখলুম প্রথম আমেরিকার হস্টেলে গিয়ে? নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ মধ্য রাতে, বেড়ালের থাবার মত নৈঃশব্দ্য, যেন ধ্যানে, যেন স্বপ্নের মধ্যে লেখা হয়ে গেল চমৎকার, ছোট্ট এক নৈঃশব্দ্যের কবিতা। দিলুম 'দেশে' পাঠিয়ে। দিন যায়। বেরুচ্ছে না। পরের কবিতা বেরিয়ে গেল। হঠাৎ একদিন জীবনানন্দ ঘাঁটতে গিয়ে দেখি 'বিড়াল'। আমার কবিতার খানিকটা ব্যাপার, একটি লোফালুফির চিত্রকল্প—উনি দেখলুম আগেই লিখে গেছেন, একটু এদিক ওদিক করে। সাগরময় ঘোষ নেহাৎ দয়ালু বলে আমাকে পত্রযোগে পুলিসে দেননি। অমন জাজ্বল্যমান "প্রভাব" আমার আর কোনো কবিতায় এখনও পর্যন্ত পাক্‌ড়াও করতে পারিনি। তবে ইচ্ছে করে অনেক কবির অনেক পঙ্‌ক্তিই তো আমি পুরাণের মতো করে সচেতন ব্যবহার করি। উপনিষদ্‌-বাইবেল থেকে ওমর খৈয়াম, গালিব, বুদ্ধদেব-অরুণ সরকার থেকে তারাপদ-সুনীল-সুব্রত চক্রবর্তী পর্যন্ত। একে বলবো 'চয়ন'। প্রভাব খুঁজুক অন্য লোকে।

"কবি তুমি গদ্যের সভায় যেতে চাও? যাও, কিন্তু পা যেন টলে না।"—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

গদ্য লিখছি বলে কবিতা কম লেখা হচ্ছে? কি জানি। গদ্য

লিখতে আমার প্রচণ্ড পরিশ্রম হয় ঠিকই, কেননা লেখার ধরনটা কবিতার কাছেই শেখা। বারবার কাটি, বারবার টুকি, বারবার লিখি। কিছুতেই যেন আশ মেটে না। যতক্ষণ না অগত্যা ছাপাখানায় চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ কেবলই বদলে যেতে থাকে। ছাপতে গেলেই ব্যস্। তখন আমি নিস্পৃহ বৈরাগী। কি গদ্যে কি পদ্যে। তখন প্রুফটুকুনি পর্যন্ত দেখবারও ধৈর্য থাকে না।

গদ্যে যা লিখি, পদ্যে তা লিখি না। এটা খুব জরুরি। কবিতায় মানুষ তো তাই লিখবে, যা গদ্যে কিছুতেই লেখা যায় না? যা গদ্যেও লেখা সম্ভব, তা গদ্যেই বেশি গুছিয়ে লেখা সম্ভব, এ আমার বিশ্বাস! কবিতায় ফুটবে কেবল সেই অধরা মাধুরী, যা গদ্যে ধরা দেয় না। যা অনিবার্যভাবে, বিশুদ্ধভাবেই কবিতার।

বিভিন্ন মাধ্যমে লিখলে নিজেকে পূর্ণতর ভাবে মেলে ধরা যায়। কবিতাকেই যে সর্বত্রগামী হতে হবে, আমি তা মনে করি না। কেবল বিচিত্র পথে গেলেই হলো। ফর্মূলায় বদ্ধ হয়ে যেন পড়ে না কবিতা। সে বড় দুঃখের। জীবনের বিভিন্ন স্বাদের প্রকাশের জন্য ভিন্ন জাতের শিল্পরূপ বেছে নেওয়াই স্বাভাবিক। গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতার ছবি গদ্যে ভালো ফোটে, ব্যক্তিগত অনুভূতির জন্য আমার কবিতা। বিচার-বুদ্ধিতে সর্বতোভাবে উপলব্ধ হলেও, যে সত্য তত্ত্বমাত্র, পরোক্ষ, বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা, তা নিয়ে আমি উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখতে পারি। কবিতা পারি না। যা প্রত্যক্ষ রক্তের ভিতর থেকে উঠে আসছে, যা নিজের জীবনের মূল্যে কিনেছি, কেবল তাই নিয়ে কবিতা। এটা সবার ক্ষেত্রে সত্য না হতে পারে, আমার কাছে সত্য।

লিখে ইতিহাস হয়ে যাবো এমন আশা করি না। কিন্তু যদি এক মুহূর্তের জন্যেও আরও একজন মানুষের হৃদয়ে গ্রাহ্য হয় আমার

লেখা, তাকে মগ্ন করে রাখে, তাতেই আমি ধন্য, কৃত-কৃতার্থ। এইটুকুই আমার লোভ।

আসলে তো জানি, কবি সেই ভালেরির পাম গাছের মতো। বৃক্ষের কর্তব্য ফলগুলিকে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা, স্বাদে, গন্ধে, রসে পূর্ণ করা। তারপর পাকা ফলটি যখন বৃন্ত থেকে খসে পড়বে মাটিতে, সেই থেকেই সে গাছের পর। ঝরা ফলের কথা গাছ ভাবে না। ভাবে পরের ফলটি তৈরি করার কথা। তেমনি কবির কাজ কেবল কবিতাটি প্রস্তুত করা। একবার প্রকাশিত হয়ে গেলে সেই কবিতার ওপরে কবির আর প্রভুত্ব কিসের? তখন সে পাঠকের সম্পত্তি। পাঠক-সমালোচক কবিকে বকুক ঝকুক, আর মাথায় তুলে নাচুক, তাতে কবির বিকার ঘটা উচিত নয়। পাকা ফলটি বনের মাটিতে পড়লে, সে ফল যে পায় তার। সেটি গো-ব্রাহ্মণের হিতে লাগলো, না শেয়ালে শূয়োরে মাড়িয়ে গেল, গাছের তাতে কী এসে যায়?

সমালোচক আশ্রম মৃগ, ন হন্তব্যম্। আজ যদি সে তোমার ফুলবাগিচা মুড়িয়ে খেয়েও যায়—তবু, সংহত করো, সংহত করো, কবি/বাক্যের বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ংকর! ফুল তুমি আবার ঢের ফোটাতে পারবে। সেই যে নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথিবীর সঙ্গে চুক্তি আছে না?

কবিতা তো দর্পণ, দেখতে জানলে ভালো কবিতায় জীবনের ছবি সম্পূর্ণই খুঁজে পাওয়া যাবে। সৎ কবিতা হলো টাইম ক্যাপসুল। তার মধ্যে অতি সংক্ষিপ্তসারে কবির অন্তর-বাহিরের সবটুকুই গুছিয়ে তোলা থাকে। সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের মতো কবিতায় ধরা পড়ে যায় পরিপার্শ্বের সূক্ষ্মতম কম্পনও—ইতিহাস, দর্শন, সমাজ, ধর্ম, মানুষের জীবন সত্য। তার জন্যে কবিকে আলাদা করে চেষ্টা করতে হয় না।

একটা একটা কবিতায় নয়, কবির সমগ্র কবিতা থেকে এই সামগ্রিক ছবি ঠিক উঠে আসবে।

শুনি, কবিতা নাকি পলায়ন। অথচ আমি তো দেখি কবিতাই স্থিতি। আমার জীবনের প্রথমতম প্রত্যয়। পায়ের তলা থেকে যতবারই মাটি কেড়ে নিয়েছে জীবন, ঠেলে দিয়েছে একটা হিম-হিম অন্ধকার গর্তে, কবিতা ততবার এসে হাত ধরেছে, টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে শক্ত জমির ওপরে। আলোয়, উষ্ণতায়। ঈশ্বরের মতো, কবিতারও বড়ো মমতা। শত হেলাফেলাতেও কবিতা কবিকে একবারে পরিত্যাগ করে যেতে পারে না। ফিরে ডাকার অপেক্ষায় থাকে।

আর মানুষ ?

মানুষ চন্দ্র সূর্যের মতো। ঘিরে থাকে, কিন্তু দূরে থাকে। আলো দেয়, তাপ দেয়, কিন্তু আপন হয়ে যায় না। যতোই ডাকো। আছে। কিন্তু কাছে নেই।

আপনার বলতে সঙ্গে আছেন. সঙ্গে থাকেন কেবলমাত্র ঈশ্বর। আর, হয়তো, কবিতা ?

মানসগঙ্গোত্রী

চুলের মধ্যে চুইংগাম হয়ে আটকে আছে চোদ্দ বছর
বয়েস / করতলে কৈশোর / ভুরু বেয়ে গলে
পড়ছে চাঁদের মোম / যোগফল : শূন্য /—

স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নের যোগফল :
শূন্য / যেমন বাতাসের সঙ্গে শিশিরের /—

চোখের ভেতরে চোখ জুড়ে চোখ জোড়া
ধূলায় বিছানো / শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ···

একে কি ভালো বলবো /
একে কি বাসনা বলবো /
মাথার ভেতরে এই অরণ্যপ্রান্ত / বুকের
ভেতরে এই ষাট মাইল নির্জন নির্যাস মঞ্জরিত
শালবীথি / চোয়ালের ভেতরে পর্বত / গলার
গভীরে বালিয়াড়ি / মাথার মধ্যে জলপ্রপাত /
বুকের ভেতরে বুকজোড়া মাঠ / চোখের ভেতরে
চোখজোড়া চাঁদ / নখাগ্রে নক্ষত্ররাজি /
করতলে কৈশোর / পাঁচ আঙুলে পঞ্চনদে
মুষ্টিবদ্ধ কৈশোরের কান্না গলে পড়ে···
মুক্তিহীন

কলকাতা ১৩৮২

[এই কবিতাটির চেহারা প্রথমে ভাঙা লাইনে, কবিতার মতোই দেখতে ছিল। তারাপদ, তার 'কয়েকজন'-এর মলাটের মাপে ধরিয়ে দেবার জন্যে পরপর টানা গদ্যে ছেপে দিয়ে বললে,—"ওটা যেভাবে ছাপা হোক, কবিতা যে, তাতে সন্দেহ হবে না।"]

নটী নবনীতা অথবা আমার অভিনেত্রী জীবন

কী করে লেখক হলাম, বা 'আমার সাহিত্য জীবন' ইদানীং খুব চালু পাঠ্যবস্তু। এটা আগেই না লিখে ফেললে শেষপর্যন্ত লেখক হওয়া যায় না। প্রথমে ভেবেছিলাম ওই রচনাটাই ফলাও করে লিখে ফেলব। তারপরেই খেয়াল হলো, জগতে লেখকের আত্মজীবনীর যতোই কদর থাকুক, অভিনেত্রীদের আত্মকথার কদরটা কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি। তাই ওটার বদলে এইটেই লেখা স্থির করছি। সিদ্ধ সাহিত্যিক হই বা না হই, সাহিত্যে শখটুকু আর পত্রিকায় যোগাযোগটুকু থাকলেই যেমন দিব্যি 'আমার সাহিত্য জীবন' বলে পাতার পর পাতা লেখার অধিকার জন্মায়, তেমনি অভিনেত্রী হই বা না-হই, আন্তরিক অভিনয়ের শখ থাকলেই নিশ্চয়ই 'আমার অভিনয় জীবন' বলে প্রবন্ধ লেখা সম্ভব। সিদ্ধিলাভের প্রশ্নটি এসব ক্ষেত্রে নেহাত অবান্তর। মহৎ শিল্পের প্রয়াসটুকুই তো সব। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচ ন।' বহ্বারম্ভের গল্পটাই আসল। ক্রিয়া লঘু না গুরু তাতে কী এসে যাচ্ছে? অনেকখানি ইচ্ছের সঙ্গে একটুখানি স্মৃতি, অনেকখানি স্বপ্নের মধ্যে এক চামচে সত্য, আমিত্বের এই আলো-আঁধারিতেই তৈরি হয় সেই জরুরী রচনাটি, যা আপনাকে এক কথায় আপনি-যা-হতে-চান তা-ই

বানিয়ে দিতে পারে। আমার এই লেখাটি সেই 'বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই'-এর কাহিনী। বলা যায় না, এই লেখাটির ফলেই কোনোদিন ইতিহাসে 'প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী' বলে পরিচিত হয়েও পড়তে পারি। 'নটী নবনীতা' বলে হয়তো যাত্রার পালাই তৈরি হয়ে যাবে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে। এভাবেই নিজের কিংবদন্তী নিজে তৈরি করতে হয়।

আমার অভিনয় জীবন সংক্ষিপ্ত এবং অখ্যাত হলেও তার ক্ষেত্র যথেষ্ট ব্যাপক। বহু বিচিত্র মাধ্যমে, বিভিন্ন উপায়ে আমার অভিনয় প্রতিভার বিবিধ বিকাশ ঘটেছে। কখনো রঙ্গমঞ্চে, কখনো রূপালী পর্দায়, কখনো মাঠে-ময়দানে, বেতারে, সাঁতারে অর্থাৎ স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে কোন্ খানেই-বা নৃত্য-গীতাদি দ্বারা জনতার মনোরঞ্জন করিনি? আমি পশ্চিমবঙ্গের 'লোকরঞ্জন শাখা'-কে একাই হার মানিয়ে দিতে পারি। নাচ বলুন, গান বলুন, নাটক বলুন, আবৃত্তি বলুন, কোন্টা পারি না? কোন্টাতে পাবলিকের সামনে উপস্থিত হইনি? হতে পারে যে ময়দানে আমি নেচেছি ব্রতচারী, নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সখীর দলে, পাড়ার সরস্বতীপুজোয় ও স্কুলের ফাংশানে সর্বদাই কোরাসে গেয়েছি (এবং প্রধানত সমাপ্তি সঙ্গীতে), তা আমার তো এখানে স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে কাজ নেই, এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কথা।

যেবার সাগর সেন অর্জুনের গানগুলো গাইলেন, সেবারে কিন্তু আমি সখীর দলে ছাড়াও একটা নাচ নেচেছিলাম। গ্রামবাসীর দলে। অবশ্য সখীর দলে নাচতে আমার ভালোই লাগতো, তবে পরিচালকদের পক্ষপাতের দোষে কখনই মঞ্চের সামনের দিকে নাচতে চান্স পাইনি। আমি একটু অরিজিন্যাল প্রকৃতির তো, তাই অন্যদের সঙ্গে হাতের কাজটা মন দিয়ে মেলাতে চাইলে পায়ের

কাজটা আপনা-আপনিই কিঞ্চিৎ অরিজিন্যাল হয়ে যেতো। দুঃখের বিষয় এই অরিজিন্যালিটির মূল্য কেউ দিতো না—না দলের বন্ধুরা, না দর্শকরা। নাচ দেখে এসে একবার বাবা বললেন, 'আচ্ছা খুকু, সবাই যখন নাচতে নাচতে বসে পড়লো, তুই একা একা তখন দাঁড়িয়ে রইলি কেন রে?' আরেকবার মা বললেন, 'সবাই যখন ডানদিকের উইং দিয়ে বেরুচ্ছিল, তুই আপনমনে নাচতে নাচতে অমন বাঁ-দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলি কেন?' আর একবার, সে নাচের বেলায় আমার স্টেজে মোটে ঢোকবারই কথা নয়, কিন্তু অন্যমনস্ক-ভাবে একটু ঢুকে পড়েছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে একটা লোমশ হাত আমার ওড়না খিমচে ধরে হিড়হিড় করে উইংসের ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। কিছু দর্শক হেসে উঠলেন। আর নৃত্য পরিচালক মণি বর্ধন মশাই আমার কানটা মুলে দিলেন। এটাও হয়েছিল নিউ এম্পায়ার স্টেজে। যে-সে স্টেজ নয় বাবা! আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতার একক এবং অবিসংবাদিত অপেশাদার রঙ্গমঞ্চ—নিউ এম্পায়ার। সেই পরম শ্রদ্ধেয় নিউ এম্পায়ারে আমি নেচেছি, গেয়েছি, অভিনয় করেছি। আরো কি চাই? কোন্ ভাষায় অভিনয় করিনি বলুন? বাংলা, ইংরিজি, ফরাসি, সংস্কৃত, এমনকি মূকাভিনয় পর্যন্ত। যে ভাষা জানি, যে ভাষা জানি না, যে ভাষায় অল্পবিদ্যা, যে ভাষায় স্বয়ংসিদ্ধা, এমনকি না-বলা বাণীর ঘনযামিনীতে পর্যন্ত হোঁচট খেয়ে এসেছি। মূকাভিনয়ের অভিজ্ঞতাই অবশ্য আমার সবচেয়ে বেশি, কেননা মঞ্চে অধিকাংশ রোলেই আমার কোনো বাক্যাংশ থাকতো না। মার্সেল মার্সো তো আর নেই, তবে আমাদের যোগেশ দত্ত আছেন, তিনি দেখলে বুঝতেন সে মূক অভিনয় কোন্ দরের! সেই সব অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুতি-ই কি কম

ছিল! এক তো দিনের পর দিন 'রিহার্সালে' যাওয়া। তখন রিহার্সালে গেলেই কিছু-না-কিছু খাওয়াতো। সন্দেশ, রসগোল্লা, কচুরী, সিঙারা, বিস্কুট, ডালমুট এইসব ভালো ভালো খাদ্য। তাই নিত্যি নিত্যি নিয়মমাফিক রিহার্সেলে যাওয়াটা প্রত্যেকেরই অবশ্য-কর্তব্য ছিল। এছাড়া অবশ্যকর্তব্য ছিল মায়ের বুকে পা দিয়ে তাঁর বিয়ের বেনারসী জোর করে নিয়ে গিয়ে তাতে ছোপ-ছোপ আলতা লাগিয়ে আনা, মাসীমার সিল্কের শাড়ি চেয়ে নিয়ে গিয়ে ঘুঙুর বাঁধিয়ে ফালা ফালা করে আনা, মায়ের সোনার হার, দুল, চুড়ি চেয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য বন্ধুদের সজ্জায় সাহায্য করা (এবং এক পাটি করে দুল হারানো), বাড়ির সমস্ত ট্যালকম পাউডার, স্নো এবং সিদুঁর গ্রীন রুমে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে আসা—এসবই ছিল অভিনয়ের অভিন্ন অঙ্গ। এ অত্যাচার আমরা প্রত্যেকেই করতুম যে যার মায়ের ওপর। নাচটা তাই মা বেশিদিন কন্টিনিউ করতে দেননি।

কিন্তু আমার প্রথম মঞ্চাবতরণ ঘটেছিল চার বছর বয়সে 'ডাকঘরে' সুধার ভূমিকায়। সেই আমার অভিনয় জীবনের হাতে খড়ি। আমার দিনটা খুব মনে আছে, কেননা ঐদিন আমাকে একটি লাল টুকটুকে চেলির শাড়ি পরানো হয়েছিল, পায়ে রুমঝুম রুপোর নূপুর কিনে দেওয়া হয়েছিল। শুনেছি ঐ শাড়িটি আমার অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে অনিন্দিতা দেবী (কবি অমিয় চক্রবর্তীর মা) উড়িষ্যা থেকে পাঠিয়েছিলেন। আমার হাতে একটা অপরূপ পেতলের সাজি ছিল ফুলে ফুলে ভরা। সাজিটা শুনেছি মা পেয়েছিলেন 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে'র সতীশ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে। উপকরণের অভাব ছিল না। জানালার

ভেতরে অমলও বসেছিল। আমি জানলার পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে অমলের কানে কানে আমার যা বলবার, তা বললুম। কিন্তু অমলের আমাকে যা বলবার, তা না-বলে সে কেবলই ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'অমন করে নয়। খুব জোরে জোরে খুব জোরে জোরে।' আর দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা চীৎকার উঠল: 'এদিকে ফিরে, এদিকে ফিরে!' আমি ঘাবড়ে না-গিয়ে দর্শকদের হাত নেড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' তারপর এক দৌড়ে স্টেজের সামনে গিয়ে আরেকবার আমার পার্টটা আবৃত্তি করে দিলুম। তাতে সবাই খুশি হয়ে জোরে জোরে হেসে উঠলেন এবং (শুনেছি তিনি মৈমনসিংহের জমিদার) এক ভদ্রলোক আমাকে সত্যি সত্যি স্বর্ণপদক উপহার দিলেন। আরো দুজন দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। অবশ্য তাঁরা পরে আর কিছু দেননি। আমার অভিনয়ের স্বর্ণযুগের সেই সূচনা।

সমাপ্তিও সম্ভবত সেখানেই। কেননা তারপর থেকেই কেবল স্খলন, পতন, অবক্ষয়। বর্তমান স্বরভঙ্গ হবার আগে, প্রচুর আবৃত্তি করেছি এককালে। তখন এমন ভাড়াটে আবৃত্তিকার পাওয়া যেতো না। ভালো আবৃত্তির কদর ছিল। কলেজে পড়ার সময়ে পাড়ার ক্লাবের ঋতু উৎসবগুলোয় বর্ষা বলুন, বসন্ত বলুন, শরৎ বলুন, আমাকে সর্বদা গদ্য অংশগুলো রচনা করে গীতব্য গানের মধ্যে পারম্পর্যের সেতুবন্ধন করে দিতে হতো। এবং উইংসের আড়াল থেকে সেসব অংশ আবৃত্তি করতে হতো। সে ব্যাপারে কদাচ গণ্ডগোল হয়নি। মুশকিল হতো কেবল স্টেজে নামলে। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে' একবার আমি হয়েছি কর্ণ, আমার এক বন্ধু কুন্তী। স্টেজে যখন খুব ভাব দিয়ে বলছি, 'আজি এই রজনীর তিমির ফলকে প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ—' এমন সময়ে দর্শকদের মধ্যে একটা গলা বলল, 'ধুতি, ধুতিটা খুলে

গেছে! কর্ণের কাছাটা একটু তুলে।' কী বলছিলুম ভুলে গিয়ে আমি যেই কাছা গুঁজতে হাত পিছনে পাঠিয়েছি, অমনি হাসির রোল উঠল। কেননা কাছা আদৌ খোলেনি। ওটা পাড়ার ছেলেদের দুষ্টুমি। আমার অভিনয়ের ভাগ্যটা ভালো নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা যথেষ্ট।

ভালো করে ভাবলে দেখা যায় যে আমার যাবতীয় নাট্যাভিনয়ের মধ্যে একটা আশ্চর্য সাধারণ সূত্র আছে। নাটকের কাল, নাটকের স্থান, নাটকের ভাষা, নাট্যকারের নাম যা-ই হোক-না-কেন, আমার ভূমিকাটি একই থেকে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কি রবীন্দ্রনাথে, কি শেক্সপীয়ারে, কি মলিয়েরে, কি কালিদাসে—আমার ভূমিকা অভিন্ন। মূকাভিনয়ের পরেই যে ভূমিকাতে আমি সবচেয়ে বেশিবার অবতীর্ণ হয়েছি তা হলো ঝিয়ের পার্ট। এমনকি রাজার পার্ট হলেও সূত-পুত্রের চেয়ে ওপরে উঠতে পারিনি। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী কোঁচানো ধুতিতে ছবি বিশ্বাস যেমন জমিদার, ড্রেসিং গাউন আর দাঁতে-কামড়ানো পাইপে কমল মিত্তির যেমন শিল্পপতি, বিভিন্ন বেশবাসে, বিচিত্র ভাষায় হলেও মঞ্চে নবনীতা তেমনি ঝিয়ের আর্কিটাইপ। আবাল্য যৌবন। 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসে' পোরশিয়ার ঝি আর 'উত্তর রামচরিতে' মাসীমার বেনারসী পরে তাম্বুলকরঙ্ক-বাহিকা। আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে পড়বার সময়ে 'দি ইটালিয়ান স্ট্র হ্যাট' ফরাসিতে মঞ্চস্থ হলো নিউ এম্পায়ারে। সেই নাটকেও হলুম নায়িকার সমথ্য ঝি, যাকে কিনা নায়ক বাবাজীর মাঝে-মধ্যে চোরা-গোপ্তা চুম্বন করবার কথা। হবি-তো-হ সেবারে নায়কের ভূমিকায় নামলেন ডাক্তার হাজরা (যিনি পরে হয়েছিলেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খানের শ্বশুর)—আমার ক্লাশমেট মনীষার সাক্ষাৎ বাবা। তা স্টেজে উঠে মেশোমশাইয়ের তো আমাকে চোরাই চুম্বন করা কর্তব্য।

অথচ সেটার নিত্যনৈমিত্তিক মহড়া দেওয়ায় আমাদের দুই পক্ষেরই বিশেষ ব্যক্তিগত অসুবিধে রয়েছে। দেখে শুনে সাহেব পরিচালক দয়া করে রায় দিলেন যে ওটা কেবল ড্রেস আর স্টেজ রিহার্সালে দু-বার প্র্যাকটিস করে নিলেই হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমি ইং-ফ্রেং-সং তিন ভাষাতেই ঝি-গিরি করেছি, তা বলে বাংলাতেও করিনি ভাববেন না। শচীমাতা গো, আমি চার ভাষাতেই জনম-দাসীটি! যেবার সরস্বতী পুজোতে 'স্নানে চলেছেন শতসখী সনে কাশীর মহিষী করুণা—' করা হলো, আমরা ছোটরা তিনজনে 'শত সখী' হলুম। তারপর আমাকেই আরেকবার মায়ের সিল্কের শাড়ি বদলে বৌদির ছাপাশাড়ি পরে এসে 'কিঙ্করী' হতে হলো। ঐ রোলটা আমার একটুও পছন্দ হয়নি—কিন্তু আর দু-জন 'শত সখী' আমার চেয়েও ছোট, একদম গুড়গুড়ি। তারা তো রানীর চুড়ি-টুরি খুলতে পারবে না। অবশ্য নানান নাটকেই সভাসদের পার্টটাও আমি খুব ভালোই করতে পারতুম। পায়ের তলায় হাত বুলোনো, গোঁফ চুমরোনো, আর 'ঠিক ঠিক' বলা। শুধু কি তাই? নায়িকার ভূমিকাতেও নেমেছি। অবশ্য একবারই মাত্র জীবনে। কিন্তু সেও আমার স্পেশালাইজেশনের বাইরে নয়। সেবারে হয়েছিলুম 'শ্রীমতী নামে সে দাসী'। কেবল একটাই জরুরি পার্টে কখনো নামা হয়নি, যেটা আমার জন্যেই লেখা—সেটা হলো 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। তা দিন তো ফুরিয়ে যায়নি। ভাবতেও ভালো লাগে সেই অজ্ঞান তিমিরান্ধ গহন বাল্যকাল থেকেই জগতে ও জীবনে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে আমি একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা পেয়ে গিয়েছিলুম। রীতিমতো শ্রেণীলক্ষণাক্রান্ত, সমাজ সচেতন সেই অমোঘ ভূমিকা।

এসব তো গেল শুধু স্থল বিহার। এবারে আসা যাক জলে আর

অন্তরীক্ষে। অর্থাৎ সাঁতারে এবং বেতারে।

বেতারে 'চন্দ্রনাথ' হবে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রোজ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি, বইটই গুছিয়ে নিয়ে, 'চলি রে। আজ আবার আমার রেডিওপ্লে-টার রিহার্সাল আছে।' বন্ধুরা সসম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকে। তখন তো 'যুববাণী' ছিল না, রেডিওতে চান্স পাওয়া এমন মুড়ি-মুড়কি হয়ে যায়নি। নাটক যেদিন প্রচারিত হলো তার পরের দিন আর কলেজমুখো হইনি। কিন্তু উপায় কি? চিরকাল তো আর কলেজ পালিয়ে থাকা যায় না? একদিন যেতেই হলো। আর যাওয়ামাত্র বন্ধুরা এসে ছেঁকে ধরলো: 'অংশ গ্রহণ-কারীদের মধ্যে তোর নামটাও বললো বটে, কিন্তু কিসের পার্ট যে তুই করলি, আমরা সেটা ধরতে পারলুম না।' তা আর ধরতে পারবে কেমন করে? আমার পার্ট ছিল কাঁদো কাঁদো সুরে। আধো আধো উচ্চারণে—'দাদু ঘোওয়া' এই কথাগুলি বলা। কৈলাসনাথের দাবা খেলবার দৃশ্যে, তাঁর শিশু নাতি আমি। ষোড়শী তরুণী হয়ে কিনা কেবল কচি গলার গুণে একটি চারবছরের বালকের পার্টে নামছি? কী লজ্জার কথা। ভাগ্যিস নেপথ্যে? মৃদু মৃদু হাস্যপূর্বক রহস্যঘন নয়নে বন্ধুদের কেবল বললুম, 'হুঁ বাবা, বলব কেন? এতই ইডিয়েট তোরা ধরতে পর্যন্ত পারলি না? দূর দূর।'

অন্তরীক্ষে যেমন ঘোড়া বলেছি, জলেও তেমনি ঘোড়া হয়েছি। সিন্ধুঘোটক না অবশ্য। আমাদের সাঁতার ক্লাবে জলকেলি হতো, তার নাম 'ওয়াটারব্যালে'। নানারকম নাচ-গান-অভিনয় হতো জলের মধ্যে।

বাচ্চা বয়সের তুলনায় আমার স্ট্রোকগুলো ভালো ছিল বলে

যাতে সেগুলো ভালোভাবে প্রদর্শন করতে পারি, তাই আমাকে প্রায়ই একক ভূমিকা দেওয়া হতো। যেমন রথের ঘোড়া সেজে আমি সামনে বাটারফ্লাই স্ট্রোকে ফুলের মালার তৈরি ভাসমান রথটি টেনে নিয়ে যাচ্ছি, সুন্দরী মেয়েরা সুন্দর সেজে-গুজে মৃদুহাস্যে আমার পিছনে পিছনে ভেসে আসছে, তারা রথের আরোহিণীর ভূমিকায়। জলে আরো খারাপ রোলেও নেমেছি আমি। সিনিয়ার লাইফসেভিং সার্টিফিকেট পাশ করবার পর একবার জলে ডোবা মানুষের ভূমিকায় থেকেছি (খুব ভালো সাঁতার না জানলে এই প্রেস্টিজিয়াস রোল পাওয়া যায় না)। আমার এক বান্ধবী আমাকে উদ্ধার করার কায়দা দেখাবে আর আমার কাজ তাকে সাবধানে বেকায়দায় ফেলা। এর জন্যে সে দু-একবার আমাকে থাপ্পড়ও মারবে।

সাঁতার ক্লাবের কাঠের তক্তার প্ল্যাটফর্ম ভেঙে ফেলে, তিনতলা উঁচু গোলাপী রঙ করা ডাইভিং বোর্ড হলো যেবার, সেবার আমার ভূমিকা ছিল তিনতলা থেকে হাত বগলে দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া। শিশুই ছিলুম তখনো, ডাইভ নয়, ঝাঁপ। তিনতলার বারান্দা থেকে হাসিমুখে ঝাঁপ দিয়েছি লেকের কালো জলে। আত্মপ্রদর্শনীর এমনি মোহ।

এবার স্থলের আরেকটি দিকে আসা যাক। চলচ্চিত্র শিল্পে। রূপালীপর্দায় আমার প্রথম অবতরণ মাত্র নয় মাস বয়সে। মাথায় স্যাটিনের বনেট বাঁধা, গলায় বিব্ ঝুলছে, পায়ে স্যাটিনের জুতো চক্‌চক্ করছে, আমি একটি বিরাট সিপিয়া রঙের প্র্যামে বসে আছি। প্র্যামের হাতলে একটি ক্রীমরঙের কুকুর চেন দিয়ে বাঁধা। কুকুরটি লোমে লোমেই ভরা, চোখ-টোখ দেখা যায় না। সে হিন্দুস্থান পার্কের রাস্তা দিয়ে উন্মাদের মতো হঠাৎ ছুটতে শুরু করে। ছবি

দেখে মনে হয় না তার তখন কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল। সে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে আর ছাব্বিশ ইঞ্চি লম্বা আমি প্রচণ্ড ভয়ের নির্বাক মূর্তি হয়ে আকাশ পাতাল জোড়া বিরাট একটা হাঁ করেছি—যেন বিশ্বরূপ দেখাবো। পেরাম্বুলেটর-গাড়ির দৌড় যখন থামল, দেখা গেল আমি দুলে দুলে কাঁদছি। যদিও নিঃশব্দে কেননা নির্বাক চিত্র, তবুও আর্তনাদটা যেন কানেই শোনা যাচ্ছে : এখানেই আমার প্রথম শ্রেণীর অভিনয়।

আমার পরের ছবিটি দেড়বছর বয়সের। এই ছবি দুটোর প্রযোজনা, পরিচালনা, পরিবেশনা, চিত্রগ্রহণ—সবকিছুই দো দো ভাইয়ের কৃতিত্ব। ছবি শুরু হচ্ছে খুব রোমান্টিক পরিবেশে। ক্রীম-রঙের লেকের ধারে সিপিয়া রঙের মাঠ, তাতে ক্রীমরঙের ফ্রকপরা সিপিয়া রঙের আমি মাতালের মতো টলে টলে ছুটে বেড়াচ্ছি এবং ক্ষণে ক্ষণে নীচু হয়ে টপ করে মাটি থেকে কিছু কুড়িয়ে নিয়ে খপ্ করে মুখে পুরছি। পিছনে পিছনে চুড়িবালাপরা ব্যাকুল দুটি হাত বাড়ানো এবং শাড়ির পাড়ে ঢাকা একজোড়া চটির ছুটোছুটি। সেই হাত দুখানিকে দেখা যাচ্ছে প্রায়ই আমার মুঠো খুলে জোর করে কিছু গুগলিশামুক ছিনিয়ে নিতে। আমি তক্ষুনি ফের নীচু হয়ে বসে পড়ছি এবং দেখে তো মনে হলো মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরছি। নিরন্ন ভারতবর্ষের হাহাকারের এমন ডকুমেণ্টারি ছবি আর ক-খানা আছে কে জানে!

মাটির ঢেলা মুখে দেবার পরে ক্লোজ-আপ আছে। সেই ঢেলার স্বাদে ক্রমশ মুখভঙ্গির বিস্ময়কর পরিবর্তন হচ্ছে এবং এবারে সশরীরী আমার কাতর মাকে পর্দায় দেখা যায়, নির্বোধ সন্তানের অবিমৃষ্যকারিতার লজ্জা ঢাকছেন, তাকে বুকে তুলে নিল।

তৃতীয় ছবি আটবছরের জন্মদিনে তোলা। ঘটনাস্থল আবার সেই লেক। কিন্তু এবারে রঙীন ফিল্ম। ছোটদের জন্যে বাঁধানো গোল ফোয়ারাসমেত চিলড্রেন্স পুলটির ধারে আমি এবং আরো কয়েকজন সমবয়সী মেয়ে মহানন্দে দোলনায় দুলছি। পশ্চাৎপটের আকাশ ঘোর নীল, পায়ের নীচের ঘাস ও আশ-পাশের গাছপালা ঘনঘোর সবুজ, আমরা প্রত্যেকে ঘোরতর বাদামী এবং আমাদের দাঁত ও চোখ ঝক্‌ঝকে রুপোর মতো সাদা। সকলে মিলে লাইন বেঁধে শ্লিপ খাবো বলে স্লাইডের সিঁড়িতে চড়ছি। একে একে বালিকারা উঠছে এবং একে একে হেসে গড়িয়ে পড়ছে স্লাইড বেয়ে। দাদার ক্যামেরা চমৎকারভাবে খেলার মুডটা ধরছে। আমিও চড়লুম। হাসতে হাসতে। গড়িয়ে পড়লুম অন্যদের মতো। তারপরেই আমার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেলো। মা ধরিত্রী কি প্রত্যাখ্যান করলেন আমাকে? কী করে জয় করলুম মাধ্যাকর্ষণের টান? চন্দ্র-বিহারী সাহেবদের মতো আমার পা-দুটি শূন্যে ছটফট করছে, কপালে চন্দন, গলায় অতিশুভ্র গোড়ের মালা, মাথায় মস্তো লাল রিবন, এই নবীনা পার্বতী স্লিপের মধ্যপথে ন যযৌ-ন তস্থৌ। সাসপেনডেড ইন মিডএয়ার—ত্রিশঙ্কু স্টাইল। পিছনের অদৃশ্য পেরেক থেকে আমি ফ্রক সুদ্ধু ঝুলন্ত এবং ফ্রক কেবলই দ্রুতবেগে গুটিয়ে যাচ্ছে। দু-পাশের হাতল দুহাতে চেপে ধরে থাকতে হচ্ছে বলে হাঁটু ঢাকবার উপায় নেই। অবিলম্বেই অনিবার্যভাবে সিপিয়া রঙের পেট বেরিয়ে পড়ল। কাঁচাহাতের ক্যামেরা তবুও বিষয়ান্তরে সরলো না। এবারে দেখা গেল, অভিনয় কাকে বলে—উৎসবের উজ্জ্বল হাসি কিভাবে পর্যবসিত হয় লজ্জা, অপমানের আকুল কান্নায়—শিখতে হলে প্রত্যেক অভিনেতার ঐ ছবিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা উচিত। জন্মদিনের

রঙীন চলচ্চিত্র ওখানেই সমাপ্ত কিন্তু আমার চলচ্চিত্রজীবন ছড়িয়ে পড়েছে আরো দূরে। ডকুমেণ্টারি ও ফীচার ফিল্মের কমার্শিয়াল আঙিনাতে।

যেমন ধরুন, ন্যাশনাল লাইব্রেরির ওপরে ষাটের দশকে একটি ডকুমেণ্টারি তৈরি হয়েছিল। আমার স্বভাবটাই বেজায় ন্যালাখ্যাপা, লাইব্রেরিতে যে তখন অতবড় ব্যাপারটা হচ্ছে, টের পর্যন্ত পাইনি। টের পেলুম দিল্লিতে 'সাউণ্ড অফ মিউজিক' দেখতে গিয়ে। ডকুমেণ্টারিতে হঠাৎ দেখি জাতীয় গ্রন্থাগারের একটা কিউবিক্‌লে অষ্টাবক্র মুনির মতো এঁকে-বেঁকে নীচু হয়ে তলার তাক থেকে আমি একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বের করে আঁচল দিয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগলুম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে—ক্যামেরা অচেতন। ফের সেই পরিচারিকারই ভূমিকায়। নিয়তিনির্দিষ্ট। কেন, দু-এক মিনিট বাদে যদি ঐ ছবিটা ধরতো, তাহলেই কি দেখা যেতো না যে আমিও ঐ কিউবিক্‌লের চেয়ারে বসে অন্যান্য পড়ুয়াদের মতোই গভীর মনোনিবেশে ওই মোটা বইটিই পড়ছি? বিরক্তির বদলে মুখে-চোখে স্বর্গীয় বিভা! কিন্তু তা হবার নয়। ভূমিকাগুলি স্বর্গেই স্থির থাকে, আমরা মর্তে এসে যার যা নির্দিষ্ট রোল, তাতে পার্ট করে যাই মাত্র।

ফীচার ফিল্মে, পূর্ণেন্দু পত্রী একবার একটি কবি সম্মেলন করিয়েছিলেন 'ছেঁড়া তমসুক' ছবিতে। শক্তি, সুনীল, শরৎ, তারাপদ ছিল। আমিও ছিলুম। শ্রোতাদের ওপরে যখন একবার অন্যমনস্ক ক্যামেরার নজর ঘুরে যায়, তখন গালে হাত রেখে নিবিষ্ট নয়নে কবিতা শুনতে মগ্ন দুটি পরমা রূপসীর মধ্যিখানে আরেকজনকেও দেখা যায়, হিপোপটেমাসের মতো স্বর্গ-মর্ত-গ্রাসী হাঁ করে হাই তুলছে। দেখলেই মনে হবে: 'কেন যে এরা কবি সম্মেলনে আসে?' সেই

হাইটাই আমায়। সেই অযোগ্য শ্রোতা আমি। কারণ কিন্তু বোর্‌স্ নয়, ঘুম। লোডশেডিং এড়াতে রাত দুটোর সময়ে পূর্ণেন্দু শুটিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বড্ড ঘুম পাচ্ছিল। পেশাদার রূপালী পর্দায় আবির্ভাবের স্মারক হিসেবে পূর্ণেন্দু আমাকে সেই মুখব্যাদানের স্থিরচিত্র দান করতে চেয়েছিলেন। আমি কিছুতেই নিতে রাজি হইনি। ও বাবা, অমন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া কি সোজা?

তবে কি জানেন, এখন আর মন মানে না। সারাটা জীবনই তো মানান বিচিত্র রোলে কাটছে। বহির্ভুবনে আমার যে ভূমিকা, তার সঙ্গে আমার অন্তর্লোকের ভূমিকাটির প্রায়ই যোগ থাকে না। কর্মক্ষেত্রে থাকতে হয় মাষ্টারের ভূমিকায়, অথচ মনে মনে আজো লাষ্ট বেঞ্চিতে বসে কাটাকুটি খেলছি। ঘরে থাকতে হয় মাতৃত্বের মহিমামণ্ডিত ভূমিকায়, অথচ যেই রাস্তায় কাচের বাক্সর গোলাপী বুড়ির চুলের ঘন্টিটা বেজে ওঠে, কি বাঁদর নাচের ডুগডুগিটা কানে আসে, অমনি আমার মন দৌড়ে চলে যায় পুবের বারান্দায়। বুকের ভেতরে মনে হয় খুবই জরুরী ডাক। যদিও থাকি গাড়ির স্টিয়ারিঙে, কিন্তু মনে মনে আছি পথচারীর রোলেই। হয়তো কোনোকালেই 'নটী নবনীতা' বলে যাত্রার পালা লেখা হবে না, মোহনকুমার—মোহিনীকুমারীরা মাথা ঘামাবেন না আমার নটী জীবন চিত্রণের কঠোর শিল্পশৈলী নিয়ে। কিন্তু গাঁয়ে না মানুক, আপ্‌নি লিখতে তো বাধা নেই? অন্যেরা যেমন করে না লিখেই লেখক হয়, আমিও তেমনি করেই অভিনেত্রী হয়ে যাবো। আগে তৈরি হোক্ জীবনী, পরে হবে জীবন। এখন ইতিহাস তো রচয়িতার হাতে।

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।'

ইদানীং কলকাতা শহরে অন্তত এটাই দেখছি মানবজন্মে সাফল্য লাভের মূলসূত্র।

এই যাঃ। যথারীতি মূলসূত্রটি বাদ দিয়ে, আশপাশের বাজে ব্যাপারে মন দিয়েছি আমি। ভুল হয়ে গেছে বিল্‌কুল্‌! এই প্রবন্ধে লেখা উচিত ছিল যা ঘটেনি কিন্তু ঘটলে বেশ হতো, ঘটা উচিত ছিল, তাই। তাহলে সেইটেই স্বীকৃতি পেত, 'ঘটেছে' বলে মর্যাদা পেয়ে 'সত্যঘটনা' হয়ে যেতো। আর আমি লিখেছি স্টুপিডের মতো নিছক তথ্য, শুধু যা ঘটেছে সেইটুকু। কবির মনোভূমির যোগ্য উদার বিস্তারিত কল্পনালোক আমার কই? হোমর, মিল্টন কি মধুসূদন যেমন মহাকাব্যে হাত দেবার আগে দেবীর বর প্রার্থনা করতেন, আত্মজীবনী লেখার আগে আমারও উচিত ছিল বাগ্দেবীর কাছে একশোটি জিহ্বা, একশোটি দক্ষিণহস্ত প্রার্থনা করা—যাতে আত্মগুণ-গাথা প্রচারের যথাযোগ্য কল্পনাশক্তি অর্জন করতে পারি। তা যখন পারিনি, নেহাৎ সংকীর্ণ সত্যি কথা লিখে, এ যাত্রায় 'নটী নবনীতা' হওয়ার সম্ভাবনা বোধ হয় ফস্কেই গেল।

আলাপ

আজকাল এই টেলিফোন থাকাটাই একটা দায় হয়েছে। কাজে যত লাগে অকাজ বাধায় তার তিনগুণ। একটা ফোন করতে হলে পাঁচটা রং নাম্বার হবে, বিল উঠবে ছ'টা কলের। তার ওপরে তো ক্রস-কানেকশন লেগেই আছে। তদুপরি আছে সারাদিন ছুটে ছুটে রং নম্বরের ফোন ধরার পরিশ্রম তথা আশাভঙ্গ। এসব তো গেল জটিল যান্ত্রিক গোলমাল। এ ছাড়া আছে অযান্ত্রিক সরল ঝঞ্ঝাট—যাকে বলে হিউম্যান এলিমেণ্ট। কিছু ছেলের হাতে অঢেল সময় ও অপরের টেলিফোন এবং মাথায় দুষ্টবুদ্ধি থাকাতে তারা এসবের মধ্যেও দিব্যি ফোনে ডেকে উৎপাত চালাতে ওস্তাদ। ক'দিন ধরেই আমাদের বাড়িতে এমনি একটা উৎপাত চলছে। দারুণ জ্বালাচ্ছে একটা ছেলে। ঠিক যেন হাঁড়ির মধ্যে মুখ ভরে কথা বলবার মতন একটা জলদ গম্ভীর কৃত্রিম স্বরে ফোনের মধ্যে আজেবাজে কথা বলে আর তখন ব্যাক গ্রাউণ্ডে অন্যান্য ছেলেদের কিচির মিচির শোনা যায়। ফোন ধরার কাজ করে আমার ছোট ছোট মেয়েরা, তারা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে। যতবার তারা কেটে দেয় ততবারই সে ফিরে ফোন করে। সেদিন সকালে এমনি ক'বার জ্বালানোর পর আমি মেয়েদের বললাম —"এবার ফোন করলে আর তোরা ধরবি না। সোজা আমাকে ডেকে দিবি।—দেখি, আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন!" একটু পরেই যেই আমি স্নান করতে ঢুকেছি, অমনি মেয়ে ছুটে গিয়ে বন্ধ

দরজায় আছড়ে পড়ল। —"মা! আবার ফোন। শিগগির ওকে বকবে এসো।" সঙ্গে সঙ্গে দুর্গতিনাশিনী অসুরদলনী রণরঙ্গিনীর ভূমিকায় বেরিয়ে পড়লুম। হেড অফ দ্য ফ্যামিলি বলে কথা। সাবানজল ঝরছে? ঝরুক। এতবড়ো তোয়ালে রয়েছে কী করতে? আজ বুঝিয়ে দেব বাছাধনকে গৃহস্থদের জ্বালাতন করা বন্ধ করা যায় কি যায় না। থপ্ থপ্ করে ভিজে কাপড়ে মুহূর্তেই ফোনের কাছে পৌঁছে গেলুম। ঘরের মেঝেয় সাবানজলের গঙ্গাযমুনা বইতে লাগলো। মেয়েরা উৎসুক নয়নে উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হয়ে টেলিফোনের দু'পাশে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভূমিকায়। রিসিভারটা হাতে তুললুম, যেন উদ্যত খড়্গ। ঘর থমথম করছে চাপা উদ্বেগে।

—"হ্যাল্‌ল্লোহ···।"

(গোড়াতেই একেবারে ভড়কে দিতে পারবো, এমনি একটা ত্রিলোকবিদারী হুংকার ছাড়লুম।)

—"হ্যালো।"

(হ্যাঁ। ঠি-ক যা ভেবেছি। সেই হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে কথা। সেই ছেলেটা। এতো গম্ভীর কোনো সাধারণ গলা হতে পারে না)।

—"কি ব্যাপার!!"

(ইস্পাত শীতল এবং কুলিশ কঠোর কণ্ঠে। নো লিনিয়েন্সি।)

—"নবনীতা দেব সেন আছেন?"

(কী? এতবড় আস্পর্ধা? এ্যাদ্দিন মেয়েদের সঙ্গে ইয়ারকি চলছিল—এবারে খোদ্ মায়ের সঙ্গে? এতদূর দুঃসাহস। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। আমিও হাঁড়ির মধ্যে গলা ভরে আচমকা গর্জে উঠি।)

—"তিনিই কথা বলছেন।"

[এক সেকেণ্ড স্তব্ধতা। তার পরে:]

—"নমস্কার।"

[আবার নমস্কার করা হচ্ছে! আমি নমস্কারের ধার দিয়েই গেলুম না। বরং কণ্ঠে যতটা শত্রুনাশন তেজস্ক্রিয় ছাই ভরে দেওয়া যায়, তাই দিয়ে, বিদ্রূপ-হিম শব্দগুলো কাটাকাটাভাবে ছুঁড়ে দিই :]

—"আগে মশাইয়ের নামটা কী, জানতে পারি?"

—"আমার নাম সত্যজিৎ রায়।"

...মুহূর্ত মধ্যে অসুরদলনীর খড়্গ প্রায় হস্তচ্যুত, পরন্তু কর্ণাগ্রে অগ্নিক্ষরণ, এবং দুমিনিট রুদ্ধবাক্ শোক পালন। এদিকে মায়ের হাব-ভাব দেখে মেয়েরা যারপরনাই উদ্‌ভ্রান্ত। তবে কি অসুরেরই জিৎ হয়ে যাচ্ছে?...ওদিক থেকেই আবার ধীর গমগমে, স্বস্থ আওয়াজ উঠল :

—"নবনীতা দেব সেন বলছেন?"

—"আজ্ঞে একটা ভুল হয়ে গিয়েছে।"

—"এটা কি অমুক নম্বর নয়?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা অমুক নম্বর, তবে...ইয়ে...মানে...যাক গে। হ্যাঁ বলুন আমিই নবনীতা দেব সেন। নমস্কার।"

সেদিন ফোন করেছিলেন 'সন্দেশে'র অন্যতম সম্পাদক, শিশুদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন নিয়ে। 'সন্দেশে' তখন আমার একটি রূপকথা বেরুবে, তাতে রুশ ডাইনিবুড়ি 'বাবা য়াগা'র নামটি ছিল। সত্যজিৎ-বাবু প্রশ্ন করলেন 'য়াগা'র আগে একটা 'ই' বসিয়ে দিলে হয় না? 'ইয়াগা' লিখলে বাচ্চাদের হয়তো উচ্চারণের বেশি সুবিধে হতো। সেদিন দুটো জিনিস জানা হলো। এক : যে-মানুষ তাঁর হাজার ধরনের লক্ষটা কাজ নিয়ে সদাব্যস্ত, তিনি যে শিশুদের ছোট ছোট সুবিধে-অসুবিধের কথাও এতটা খুঁটিয়ে ভাবেন, তা কি আমরা

জানি? আর দুই: এটা এমনই একটা সামান্য বানান বদল, যাতে আপত্তির কিছুই থাকতে পারে না। এরকম তুচ্ছ ব্যাপারে পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে লেখকের মত নেওয়ার সাবেকী ভদ্রতাটুকু ইদানীং এই ব্যস্ততার যুগে মহার্ঘ। আমি তো তাঁকে দিব্যি ভালো মানুষ ভাবলুম, কিন্তু সত্যজিৎবাবু ওই অপরূপ আলাপ শুনে আমাকে যে কী ভাবলেন তা আর জানা হয়নি। তবে, ফেলুদার স্রষ্টা কি আর ধরতে পারেননি যে কোথাও একটা কমেডি অফ এররস হয়ে গিয়েছে? তিনি তো জটায়ুরও স্রষ্টা!

আমি কিন্তু সেই থেকে আর টেলিফোনে বিশ্বশাসনের চেষ্টা করিনি।

ع

ছন্নপ্রশ্ন ঃ ছিন্নচিন্তা

আকাশবাণীতে এক ঘোষণা শুনে দিব্যদৃষ্টি খুলে গেলো। "এখন প্রবন্ধ পাঠ করছেন কবি ও সাহিত্যিক অমুক।" প্রবন্ধপাঠান্তে পুনর্ঘোষিত হ'লো সেই অমোঘ নির্দেশ—"প্রবন্ধ পাঠ করলেন কবি ও সাহিত্যিক অমুক"।

সব সাহিত্যিক কবি নন, সেটা জানি। কিন্তু সব কবিও যে সাহিত্যিক নন, সেটা আগে টের পাইনি। কবিরা তো মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়; তা বলে তারা সাহিত্যিকও নয়?

তবে কি কবিতা সাহিত্য নয়? অন্য কিছু? আভিধানিক অর্থে সাহিত্য হলো সঙ্গ সংসর্গ, সহযোগ, আরো শক্ত করে বললে—এক-ক্রিয়ান্বয়িতা। কবিরা শুনেছি বড় একলসেঁড়ে, অমিশুক। একা একা থাকেন একা একা লেখেন। [আজকাল অবশ্য দলবদ্ধভাবে একা একা থাকেন, দলবদ্ধভাবেই একা একা লেখেন।] সাহিত্য হলো সমষ্টির ধন। কবিতা যদি একক ব্যক্তির ধন হয়, তার মধ্যে সঙ্গ, সহযোগ না থাকে, সমষ্টির ধন তাহলে কী, যার মধ্যে একক্রিয়ান্বয় ঘটে? 'সাহিত্য' কি তবে গদ্য? মলিয়ের-এর মঁসিয় জুরদাঁ যে শিল্পটি চল্লিশ বছর ধরে নিজের অজ্ঞাতেই চর্চা করে চলেছিলেন মৌখিক নৈপুণ্যে? যেহেতু বারোয়ারি মাধ্যম গদ্য, তাই গদ্যই কি কেবল সাহিত্য নামধেয়? অথচ কাব্যশাস্ত্রও তো সাহিত্য, সহৃদয়তাই তো কবিতার প্রথম পা ফেলা। নইলে তো যে-মাধ্যমে যত বেশি জন-

সংযোগ ঘটবে সেটাতেই 'সাহিত্যরস' তত বেশি ঘনীভূত হয়ে উঠবে—তাহ'লে সংবাদপত্রই হবে ভূতলে সাহিত্য-চূড়ামণি। অথবা, পশ্চিমি দুনিয়ায়, টেলিভিশন।

অথচ এও ঠিক কথা যে কবিরা আর শুধু কবিতা লিখেই তুষ্ট হন না, তাঁদের গদ্য লিখতে সাধ হয়। গুটি পোকা যেমন গুটি কেটে একদিন প্রজাপতি হয়ে পাখা মেলে, কবিরাও তেমনি কবিতার আড়াল ছিন্ন করে সময়মত ঔপন্যাসিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, দেখা যাচ্ছে। গদ্য লিখলে তবেই কি প্রকৃতপক্ষে 'সাহিত্যিক' হওয়া যায়? নতুবা 'কেবলই কবি?' [হায় কবি! তুমি শুধু···ইত্যাদি।]

কবিরা যেমন গদ্য-অর্থে সাহিত্যিক হয়ে উঠছেন, 'কবিতাপত্র'ও যে তেমনি 'সাহিত্যপত্র' হয়ে উঠতে চাইবে। এ আর আশ্চর্য কি? কবিতাপত্রের সন্ন্যাসবেশ ত্যাগ করে গুটি কেটে বেরিয়ে আসছে সাহিত্যপত্রের বর্ণোজ্জ্বল প্রজাপতি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একবার একটি কবিতাপত্রিকায় (অলিন্দ) লিখেছিলেন, কবি যতো বাড়ছেন, কবিতা ততো বাড়ছে না। খাঁটি কথা। দেশে পপুলেশন এক্সপ্লোশন-এর মত পোয়ট্রি এক্সপ্লোশন ঘটেছে। এতো কবি বাঙালি আগে কখনো চোখে দেখেনি। সারা বাংলা কবি সম্মেলনে প্রায় সাড়ে ন'শো কবিতা পাঠের কথা ছিলো। খান চল্লিশ লিটল ম্যাগাজিন ঐ উপলক্ষ্যে ১৬ই জুন প্রকাশ পেয়েছিলো। [প্রসঙ্গত, এ-ধরনের কবিসম্মেলন না হলে শহরবাসী কবিরা মফঃস্বলের কবিদের তাজা, তরুণ, ঝকমকে মুখগুলি দেখতে সুযোগ পান না, যেহেতু সাধারণত কবি সম্মেলনগুলি নাগরিক কবি-দ্বারাই প্রধানত অধ্যুষিত হয়। সকলের জন্য এমন মুক্তমেলা মাঝে মাঝে হওয়া তাই খুবই জরুরি।] যদি না এমন কাগজের অনটন

হতো (অন্নাভাবে কবিতাপত্রিকা বন্ধ হয় না) তাহলে পুজোর সময়ে দেখা যেতো শেয়ালদায় ওজনদরে কবিতা বিক্রী হচ্ছে। অথবা ট্রেনের কামরায় হকাররা বেচছেন: 'মাল্‌টি-পারপাস লিটল ম্যাগাজিন! পেতে বসলে ছারপোকা কামড়ায় না; কখনো বা ছাতার কাজ দেয়, রোদ, বৃষ্টি, পাওনাদার ইত্যাদি কিছুটা তেরছা ভাবে আড়াল করা যায়; সময় কাটাতে হ'লে পড়াও যায়; অন্নকষ্ট দূর না হোক, অন্নচিন্তা কিছুক্ষণের মত ঘোচে; খোকার দুধ গরম হয়; ঠোঙা বানানো যায়; লোড শেডিঙে হাতপাখার কাজ করে; আরো কতো ক্রমশ-প্রকাশ্য উপকারিতা আছে!'

আর সব জটিল কারণে যদি নাও প্রবেশ করি, কবিতাপত্রিকা প্রকাশের মূলে একটিই কারণ: প্রেম। সে শুধু নিজের নামটিরই প্রেমে হোক, বা কবিতা কল্পনালতার প্রেমেই হোক। প্রেমই কবিতাপত্রের জন্ম দেয়। প্রেম বাড়ছে, তাই কবিতাপত্র বাড়ছে, তাই কবিও বাড়ছেন। কিন্তু 'কবিতা' বাড়া অন্য এক ব্যাপার। মাস্ প্রডাকশনে উৎপন্ন দ্রব্যের মান অনেক সময়েই নেমে যায় এমন দেখা গেছে। তাই দিন দিন কবি বাড়লেও দিন দিন কবিতা বাড়ছে না এমনটা মনে হলে শীর্ষেন্দুর মত কবিতাপ্রেমিক পাঠককে দোষ দেওয়া যায় না। এখন ভাবা উচিত কেন এমনটা হচ্ছে?

কবিতা লেখা বেড়েছে, তার একটা কারণ, কবিতা লেখার 'ফরমূলা'টা 'আউট' হয়ে গেছে। যেহেতু কবিতার 'পেটেন্ট' নেই কারুর, তাই ইচ্ছুক মাত্রেই কবিতা প্রস্তুত করতে পারছেন। ষোল শতকের ইয়োরোপে যেমন চালু হয়েছিল সনেট-ফ্যাশন। সনেট লিখে প্রণয় নিবেদন না করলে সুন্দরীদের করুণা কাড়া যেতো না, প্রেমিকরা তাই রুদ্ধশ্বাসে সনেট প্রস্তুত করতেন। যে যুবকের সনেট-গতি ছিল

না তিনি ভাড়া করে লিখিয়ে নিতেন প্রণয়িনীর নামে সনেট-নৈবেদ্য। মোটামুটি সনেট-এর কলকব্জাটা বেশ অধিগত ব্যাপার হয়ে গিয়েছিলো, হাট-বাজারে ভাড়াটে সনেট-লিখিয়ে খাড়া থাকতো। নাগরিকতার একটি প্রধান অঙ্গ ছিলো সনেট সাধনা।

ইদানীং সেইরকমই 'আধুনিক কবিতা' নামক দ্রব্যটি বাঙালির দিব্যি রপ্ত হয়ে গেছে। সকলেই মক্‌শো করতে পারে, ইচ্ছে হলেই হলো। এই কায়দাটাকে বাঙালভাষায় বলে 'লব্জ' হওয়া, আর ঘটিভাষায় বলে 'সড়গড়'। প্রাচীনপন্থী কবি হওয়া বরং এর চেয়ে কঠিনতর প্রণালী ছিল; ছন্দমিলের কতগুলো ফ্যাসাদ আছে। অনেকের তাই ধারণা 'আধুনিক কবি' হতে কতো সুবিধা, ওতে ছন্দ, মিল এমন কি ভাব, ভাষা, চিত্রকল্প—কিছুই না হলেও চলে! একগোছা লিটল ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে বসে, যদি কবিতাগুলিকে ছাঁকনিতে চেলে নিই, তাহলেই বর্তমানে প্রচলিত 'আধুনিক কবিতা'র আলগা ছাঁদটা মোটামুটি ধরা যাবে। দেখা যাবে—মিশ্র ফসল। কিছু খুবই সিরিয়স প্রয়াস, কিছু হেলাফেলার কাজ। কবিতা যদি তথাকথিতভাবে সংসর্গ না করে, কবিতায় যদি নিঃসঙ্গতাই প্রধান হয়, তাহলে সেই নিঃসঙ্গতারই ধরনটা মেপে দেখা যাক।

বাংলা কবিতায় দেখা যাচ্ছে দুই প্রকারের নিঃসঙ্গতা।
(ক) সচেতন সঙ্গত্যাগ, স্ব-কাল-বিদ্রোহী চেতনা, বহির্মুখী কবিতা
(খ) নিঃসঙ্গ মেজাজ, শাশ্বত চেতনা, অন্তর্মুখী কবিতা।

ক-বিভাগে সমাজচেতনার প্রকাশ হচ্ছে সমাজদ্রোহের ছদ্মবেশে। সমাজদ্রোহের পন্থা এখানে সমাজকে কষ্ট দেওয়া, প্রথা ভাঙা। ভাবে, ভাষাতে, আঙ্গিকে, প্রধানত ধ্বংসের দিকেই নজর। নতুন কিছু গড়া হ'লো কিনা না-দেখে, পুরোনোটা কতোটা ভাঙ্গা গেলো সেদিকে

মনোনিবেশ। উপস্থিত সমাজের মূল্যবিধির বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ প্রকাশ পাচ্ছে ভাবে এবং ভাষাতে—লক্ষ্যহীনতা, নৈরাজ্য, ঈশ্বরদ্রোহ, যৌনতার বাড়াবাড়ি বা বিকৃতি, অশ্লীলতা, অশালীনতা, স্থূলতা এবং নিসর্গদ্রোহের মধ্যে। এই সামগ্রিক মূল্যবিনাশ, বা নিয়মভাঙ্গার তাগিদ আঙ্গিকে আরো প্রকট। নঙর্থক মনোভাবের প্রথম পদক্ষেপ যদি হয় প্রয়াসহীনতায়, শিল্পসৃষ্টিতে কষ্ট ও চেষ্টাকে অস্বীকার-করায়—তাহ'লে ধাপে ধাপে আকারহীনতা, ছন্দহীনতা, মিলহীনতা, ভাবহীনতা, অর্থহীনতার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে 'কবিতা' গিয়ে দাঁড়ায় শিল্পহীনতায় (শেষ পর্যন্ত মাত্রই 'হীনতায়' পর্যবসিত হতেও দেখা গেছে। "হীনযান" সম্পাদক দোষ নেবেন না)। বিকৃতির ভয় সর্বদাই রয়েছে অশ্রদ্ধার, অবিশ্বাসের শিল্পে। যেখানে অস্থিতি ও অনিশ্চয়তা, স্ব-বিরোধ ও আত্ম-সংশয় ঘনীভূত হয়ে শিল্পপ্রাণ পাবার আগেই ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেখানে সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প। এ ছাড়া শুধু ভাঙ্গনের পথ দিয়ে মহৎ শিল্পে পৌঁছুনো হয়তো কঠিনও। মহৎ শিল্পের মনোযোগ থাকবে সৃষ্টির দিকে। শিল্পে বর্জনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে—সৃজনের জন্যই সে-বর্জন। কিন্তু বর্জনেরই জন্য যে-বর্জন, তাতে সৃজনী আভা কোথায়? তবু, এই বিভাগে, শীর্ষেন্দু যাকে বলেছেন 'ঝকঝকে', সেই চিক্কণ, সমাপ্ত, চটকদার কবিতা যে চোখে পড়ে না তা নয়। কারণ সেখানে গড়ন-পেটনে মন দেওয়া হয়েছে। মূলত ভাঙাই যদিও উদ্দেশ্য, আপাতত হাতের কাজটা কিন্তু গড়ার। এখানে মিডিয়ামটা মেসেজ নয়। কবিতা-য় মিডিয়মই মেসেজ হয়ে উঠলে, ভাঙার কবিতা কি 'কবিতা' হয়? গ্রীকে 'পইয়েও' শব্দটির অর্থঃ তৈরি করা। কবিতা সৃষ্টিরই শিল্প। বিশুদ্ধ ভাঙার ক্রিয়া হয়ে উঠলে কবিতা কি 'শিল্প' থাকে?

খ-বিভাগে সমাজ বিষয়ে আপাত-অবজ্ঞা। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র বিশ্বের মধ্যে বন্দী থাকেন কবি, সমাজ রইলো কি গেলো তাঁর যেন এসে-যায় না, তিনি বিন্দুতে সিন্ধু ধরার তপস্যা করছেন। ভাষায়, আঙ্গিকে প্রচল-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নতুন-গড়ন তৈরির চেষ্টা আছে। ধ্বংসেই কাজ শেষ নয়, পরের ক্ষেপটাও আছে, নতুন সৃষ্টি। আকৃতির দিকে খেয়াল আছে, ভাষায় সচেতন প্রযত্ন। কেন্দ্রীয় ভাব প্রধানত শাশ্বত মানবিক চেতনাগুলিকে নিয়ে, যেমন: প্রেম, মৃত্যু, শিল্প, নিসর্গ, ঈশ্বর,.জীবন। এখানে লক্ষ্যসচেতনতা আছে। শ্লীলতা, সূক্ষ্মতা, শালীনতা ইত্যাদিকে আঘাত করা যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু সে-আঘাতে শিল্পের সম্মতি আছে। কবি শিল্পের সৃষ্টিশীলতায় স্বস্থ। অথচ এদের মধ্যেই প্রায়শঃ দেখি সহজাত বিচ্ছিন্নতা—'এলিয়েনেশন'। প্রকৃত অসামাজিকতা তো সমাজদ্রোহে নিহিত নয়, সমাজচেতনা-শূন্যতার মধ্যেই গূঢ় সমাজ-অস্বীকৃতি। আমার তো মনে হয় ক-বিভাগের চেয়ে খ-বিভাগের কবিরাই কার্যতঃ বেশী সংসর্গ-ত্যাগী। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, এদের বড়ো অংশটি গজদন্তমিনারের বিলাসে ভ্রষ্ট।

উভয় বিভাগেই পড়তে-ভাল কবিতা সম্ভব, ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে হয়তো মহৎ শিল্পের সম্ভাবনা কম, কিন্তু তাতে সেয়ানা চমক্-এর সুযোগ অনেক বেশি। ক-বিভাগে কবির সংখ্যা অঢেল, কিন্তু কবিতা কম। খ-বিভাগেও কবির সংখ্যা অঢেল, কিন্তু তুলনায় 'কবিতা' কিছু বেশি। সৎ-কবিতা, অসৎ-কবিতার পার্থক্য নিয়ে অনেক রকম আলোচনা শুনি। আমার মতে অসৎ-কবিতা বলে কিছু নেই। যা অসৎ, তা কবিতা নয়। শিল্প মাত্রেই সৎ। শিল্পে উত্তীর্ণ যা হয়নি, সেই বিকলাঙ্গ প্রয়াসগুলি নিয়ে শিল্পবিচার করাই নিরর্থক। মৃতবৎসা

কবিরা কোনোদিনই কবি হয়ে ওঠেন না। ভালো কবিতা, আরো-ভালো কবিতা নিশ্চয় আছে; শিল্পের সার্থকতার মানের ওপরে তা নির্ভর করে। কিন্তু মন্দ কবিতা? মন্দই যদি হ'লো, তাহ'লে সেটা কি কবিতা? শিল্প হয়ে যদি নাই উঠলো, তবে কি করে সেটা কবিতা? শিল্পরুচির ভিন্নতা অনুযায়ী পাঠকের 'ভালো-লাগা' 'মন্দ-লাগা' থাকতে পারে, কিন্তু 'ভালোশিল্প', 'মন্দশিল্প' কি হ'লে, কোন বিচারে হয়?

মহৎ শিল্প এবং সাধারণ শিল্পে কিন্তু স্তরভেদ করা যায়। শিল্পের মহত্ত্ব বলতে আমি বোঝাতে চাই সেই নিঃসময়, অবয়বাতিরিক্ত লাবণ্য, যাকে লনজাইনাস বলেছিলেন 'সাবলাইম'। যে-লাবণ্য কোনো আকার নয়, একটি আভামাত্র। যা মর্মলোককে উদ্ভাসিত করে। ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এক আস্বাদ-গ্রহণে শিল্প আমাদের সমর্থ করে, শিল্প-উপলব্ধির শুদ্ধতম, পুণ্যতম মুহূর্তে ঘটে যায় অন্তর্গত উন্মোচন। সেই দেবোপম সিদ্ধি আমাদের এনে দেয় শিল্প, শেষ বিচারে তাকেই বলছি মহৎ শিল্প। যে শিল্পের স্পর্শে মর্মস্থল মর্মরিত হয়, অন্তঃস্থ সব কুঁড়িগুলি আপনা হতে পাপড়ি মেলে দেয়।

ক-বিভাগের কবিতায় যেন মহৎ-শিল্পের দৈন্যদশা খ-বিভাগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে চোখে পড়ে, তাই নয় কি?

কবিতা-লেখা বাড়বার অন্যতম পরোক্ষ কারণ এটাও হওয়া অসম্ভব নয় যে, শিক্ষিত বেকার যতো বেড়ে যাচ্ছে, দেশে সাধারণ-ভাবে সংস্কৃতি চর্চাও তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সময় ফুরোতে চায় না, শিক্ষা আছে, রুচি আছে, বাঙালির চিরন্তন কলা-প্রিয়তা আছে, আর আছে বাস্তবের হাত থেকে ছুটি নেবার তেরছা তাগিদ মনের নিচে। শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, সর্বত্র শূন্যের অঙ্কে গোঁজামিল দেওয়া। ব্যর্থ-

ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের আলাদা করে না দেখে সামগ্রিক সামাজিক অব্যবস্থার শিকার হিসেবে দেখতে চাওয়ার মধ্যে যেন তবু একটা সান্ত্বনা আছে। তাই হয়তো ক-বিভাগের কবিতা প্রস্তুত হয় বেশি। মুখে এঁরা খ-বিভাগকে বলবেন গজদন্তমিনার বিলাসী, অথচ নিজেরা চড়ে বসেছেন অন্য এক নেশার মিনারে—যার নাম 'কবিতা'। এ মিনার শব্দের মিনার। এখানে কাজ নেই, শুধু কথা আছে। কথা ভিন্ন জীবন জুড়ে আর কিছু নেই আমাদের। তাই এত কবিতা। এত নাটক, এত গানের জলসা, এত রবীন্দ্র-জয়ন্তী। যাত্রা, থিয়েটার, জলসা, অপেরা, সিনেমা। কথা ভিন্ন কিছু নেই। কথাই মানুষ। কথার নেশায় মাতাল হয়েই মানুষ বেঁচে আছে এদেশে।

কথা কথা কথা। সংযোগ মানেই শব্দ। জীবন মানেই কথা। মন্ত্রিরা বাক্য কইছেন, সমাজসেবীরা বাক্যময়, ছাত্র, অধ্যাপক, কুলি, মজুর, কালোবাজারী আর মঠাধ্যক্ষ—প্রত্যেকেই কথার সুরায় আকণ্ঠ ডুবে আছেন। শুধু শব্দ। শুধু কথা। এখন জীবন এতই কথাসর্বস্ব যে 'কথা'ই 'কাজে'র জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। সিনেমাতেও রগ্‌রগে এ্যাকশনের বদলে চলে আসছে উদাত্ত কবিসম্মেলন। এখন শুধু ধনী হলেই হয় না। মানী হতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কবিও হতে পারলে ভাল। [মীনাকুমারী হয়তো এজন্যই কবিতা লিখেছিলেন।]

আঠারো শতকের ইয়োরোপকে বলা হতো একাধারে গদ্যের যুগ ও যুক্তির যুগ। সত্তর দশকের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রকে কি তবে বলবো 'কবিতার যুগ' ও তৎসঙ্গে 'অযৌক্তিকতার যুগ'? কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় অবিশ্যি বলবেন 'পদ্যের' ইত্যাদি! কিন্তু সব কবি অতটা বিনীত নাও হতে পারেন। কবিতা মাত্রেই কি পদ্য? নাকি পদ্য মাত্রেই কবিতা? গদ্যের সঙ্গে যুক্তির যোগ, ও কবিতার সঙ্গে যোগ

যুক্তির অতিরিক্ত কিছুর। 'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব'—মহৎ কবিতায় প্রতীয়মানের উপরেও আরও অন্য কিছু বস্তু থাকে। অঙ্গনাদের আননে যেমন লাবণ্য, কবিতাও তেমনি শব্দের দেহে এক সূক্ষ্মবিভা। গদ্যকবিতা তাহলে কি বস্তু? যা গদ্য তা কিছুতেই কবিতা নয়। গদ্য হবে সোজাসুজি, সিধেকথা। যেমন নাক চোখ ঠোঁট ভ্রূ। যা ধরা যায়। কবিতার হ'ল অধরা অস্তিত্ব। কবিতা হচ্ছে নয়নের দৃষ্টি, ভ্রূয়ের কম্পন, অধরের হাসি। এরকম হেঁয়ালি করে ব্যাপারটা বোঝা যায় বটে, কিন্তু গদ্য আর পদ্যে যেমন জল-স্থলের মত সহজ ভাগ, গদ্য আর কবিতা কিন্তু অতটা সরলভাবে সবসময় ভাগ করে ওঠা যায় না। ওখানে একটা আলোছায়ার আবছা প্রদেশ থেকে গেছে। কবিতালু গদ্য আর গদ্যালু কবিতা আমাদের বড় ভোগায়। কবিতাপত্রগুলি শুধু কবিতা আর কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ ছাপেন। আপনার সম্পাদকীয় দপ্তরে ধরুন যদি আসতো একদিন 'রক্তকরবী' বা 'রাজা' কিংবা 'ডাকঘর'-এর পাণ্ডুলিপি, সম্পাদক মশাই, আপনি তাহ'লে কী করতেন? ও সব গদ্য, না কবিতা? কিংবা বুদ্ধদেব বসুর 'পাতা ঝরে যায়'-এর মত নাটক, 'তুমি কেমন আছো'র মত 'ছোটোগল্প' কবিতা-পত্রে ছাপালে কি পাপ হবে? গদ্যকবিতা কাকে বলে? আমরা জানি গদ্য-গদ্য কবিতা হয়, কাব্য-কাব্য গদ্যও হয়, জানি "উঠ শিশু মুখ ধোও" পদ্য, কবিতা নয়, কিন্তু 'কথা ও কাহিনী' কি কবিতা, না পদ্য? "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই"-এর কবিতা কোথায়? অবয়বাতিরিক্ত লাবণ্যে 'লিপিকা' গদ্য না কবিতা? 'সে'? 'গল্পসল্প'? বড়োই গোলমেলে এই গদ্য-পদ্য-কবিতায় সাহিত্যের দিক্‌নির্দেশ করা। কেবল উদ্বেগ, কেবলই অনিশ্চয়তা। খনা-শুভঙ্করী না হয় কখনোই কবি নন। তা বলে শীর্ষেন্দু-অতীন-

বিভূতিভূষণ-সমরেশ কি কখনোই কবি নন? ইয়োনেস্কোর এ্যাবসার্ড ড্রামাগুলি কি গদ্য বলা যায়? চেখফ্, কাফকা, কাম্যু, মান, এঁদের ছোটো গল্পগুলি কি প্রায়ই 'কবিতা' নয়? এমনকি কাফকার উপন্যাসও কি গদ্য? অথবা জয়েস? স্যিঙের 'রাইডার্স টু দ্য সী' কবিতা না গদ্য? এবম্বিধ কত যে দুশ্চিন্তায় পাঠকের মাথা ভারী থাকে! গদ্যের সীমা কোথায়? গদ্য কি শুধুই 'খবর' দেওয়া? কবিতাই বা কখন শুকিয়ে উঠে পদ্য হয়ে যায়? যা সোজাসুজি খবর দেয় না—একটু দূরে থেকে শুধু শৈল্পিক অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে, তাই কি কবিতা? গদ্য কখন গলে গিয়ে 'কবিতা' হতে শুরু করে?

না-কবিতা কাকে বলবো? সায়েবরা হামেশাই বুক ফুলিয়ে 'আ নন-পোয়ম' ছাপেন কবিতাপত্রে! আমরা কাকে বলবো নন-পোয়ম? সম্পাদক কি 'নন-পোয়ম' ছাপতে রাজী? না-কবিতা কি বস্তু? 'না-কবিতা' দিয়ে শুরু করলে যদি বা 'কবিতা-কাকে-বলে'-তে এসে পৌঁছুনো যায়। কী কী কবিতা নয়? ধোবার ফর্দ, বাজারের হিসেব, ওষুধের প্রেসক্রপশন, রেস্তরাঁর মেন্যু, শুধু এগুলি কি না-কবিতা?

সুপের টিনের হুবহু চিত্রণ যদি পপ্-আর্ট ছবি হয়, তবে পপ্-কবিতা কী? আমাদের দেশনেতাদের বক্তৃতা? তাঁদেরও ভাষা-ব্যবহারের আদর্শ হুবহু মালার্মের স্বগোত্রীয়—"always use the wrong word!" যখন না খেতে পেয়ে লোকে মরছে তখন বলবো না—অনাহারজনিত মৃত্যু (সেটা সোজা গদ্য), বলা হোক বরং—অপুষ্টিজনিত মৃত্যু (সেটা কি কবিতা?)। সুন্দর শিশু বাঘটি মরলো তরুণ জন্তুপ্রেমিকের অনভিজ্ঞতার ঠেলায়, "অদূরদর্শিতা" শব্দটি সেক্ষেত্রে চলে না—তাই দুর্ঘটনা, দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, এসব অন্যবিধ দূরের

শব্দ চলে। চেয়ে দেখুন, কত কবিতা চারদিকে! কবির হাতে না বাড়ুক, কবিতা এখন ক্ষেত্রান্তরিতা হয়ে বাড়ছে। পপ্-কবিতা এখন ছদ্মবেশে দেশ মাৎ করছে।

সাহিত্য কোন্‌টি? 'সংসর্গ', সংযোগ'টা ঘটছে কখন? কবি যখন কবিতাটি লিখে খাতা মুড়ে রাখলেন, সেইটিই সাহিত্য, নাকি পাঠক যখন খাতাটি খুললেন, কবিতাটি পড়লেন, সেইটিই প্রকৃত সাহিত্য-ক্রিয়া? শৈল্পিক অভিজ্ঞতা কোন্‌টি? রচয়িতা যা লিখেছেন, সেটি, না পঠয়িতা যা পড়লেন, সেটি? দুটি অভিজ্ঞতা তো এক নয়,—গঠন ও পুনর্গঠন। কবি যা লিখলেন, পাঠক যে তাইই পড়বেন, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। পাঠকের মন—তার নিজস্ব রুচি, বুদ্ধি, আবেগ, অনুভূতি, মেজাজের মিশ্রণে আর-এক কবিতার জন্ম দেয়। একই পাঠক জীবনের বিভিন্ন সময়ে একই কবিতায় বিভিন্ন কবিতার স্বাদ পান, এও প্রমাণিত সত্য। তবে?

আমার কিন্তু মনে হয় অবিসংবাদিত কবিতা-শরীর বলে একটা কিছু ঠিকই আছে, যেটুকু সব কালে সব মানুষের কাছে একইভাবে না-হোক তবু 'কবিতা' হিসেবে মাননীয়। সেইটুকুই কবির আত্মাকে বহন করে। আর সেইখানেই সহযোগ, সাহিত্য।

কবি ও পাঠকের আত্মিক মিলনের অভিজ্ঞতাটিই সাহিত্য। তা কখনো হালকা কখনো গাঢ়—কোথাও শুধুই হ্যাণ্ডশেক, কোথাও বা চুম্বন। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক হওয়া চাই। দুটি পক্ষের শ্রীছন্দিত সহযোগ ঘটলে, তবেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সাহিত্য যেন অনেকটা জলের মত, দু'ভাগ হাইড্রোজেন হলেন রচয়িতা, একভাগ অক্সিজেন হলেন পাঠক।

তবে 'কবি ও সাহিত্যিক' ভিন্নভাবে নির্দেশ দেওয়া কেন? তবে

কবিতাপত্র সাহিত্যপত্র নয় কেন? কবিতাপত্র কি শুধুই কবিকুলের জন্য, আর সাহিত্যপত্র মনুষ্যকুলের জন্য? কবিতা কি বিশুদ্ধ কবিতন্ত্র —by the poets for the poets of the poets? 'কবি' কি শুধুই লেখক? 'সাহিত্যিক' হ'তে হলে সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায় 'পাঠকের লেখক' হতে পারা চাই? অর্থাৎ গদ্যলেখক? আমরা এবার গোড়ার কথায় ফিরে এসেছি। হে পাঠক, এ প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটিই আপনারও মনে নিশ্চয়ই জাগে। এই ছিন্নচিন্তাকে কি তাহলে দর্পণ বলা যায়? সাহিত্যও কি তাহ'লে দর্পণ মাত্রই? ওতে ততটুকুই একক্রিয়ান্বয়িতা, যতটুকু দেয় দর্পণ?

প্রশ্নাবলি এখানেই শেষ করি। ছন্নপ্রশ্নগুলি কিন্তু কোনোমতেই ছদ্ম-উত্তর নয়। শিল্পরহস্যের ব্যাখ্যা দেবার দুঃসাহস রাখি না। ম্যাক-লুহান সাহেবের ভাষায় "I am not explaining, I am exploring!" সম্পাদক মশাই, পাঠক মহোদয়, আপনারা কি বলেন?

ভালো লেখকরা কেন খারাপ লেখেন ঃ রোগনির্ণয় ও রোগমুক্তির প্রস্তাব

ভালো লেখকরা কেন ভালো লেখেন সেটা বলবার মতো কিছু নয়, সেইটেই স্বভাব স্বধর্ম। কিন্তু তাঁরা যখন খারাপ লেখা শুরু করেন, সেটা হয় অভাব এবং কখনও কখনও অধর্মও বটে! এটা কেন হয়, এবং এটা রোধ করবার কোনো উপায় আছে কিনা, সেটা ভেবে দেখবার মতো।

খারাপ লেখা পাঠকরা বেশি দিন সহ্য করেন না। দুদিন দেখে ছুঁড়ে ফেলে দেন একদার প্রিয়তম লেখককেও, আবর্জনার ঝুড়িতে। তারপর সময় তাঁকে কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। পড়ে থাকে দু' চারটি ভালো লেখার স্মৃতি। তারপর সেও মুছে যায়। গণমানসের স্মৃতিভ্রংশ রোগটা ক্রনিক। আসেন নতুন ভালো লেখক। পাঠকরা নতুন মাতামাতি শুরু করেন তাঁকে নিয়ে।—তারপর? একদিন ইনিও ফুরিয়ে যান।

সময়ের হাতে এমন কি মেধাও নষ্ট হয় তা আমরা জানি। শব্দের ঔজ্জ্বল্য কমে আসে, শান থাকে না বাক্যে। শিল্প ক্রমশ দর্শককে আসন ছেড়ে দিতে থাকে। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, তীক্ষ্ণ শোভার বাইরেই থেকে যায় অনেক সময়ে জড় বার্ধক্য। সেই কথা এখানে বলছি না। বার্ধক্যের যে ক্ষয় তার বাঁধ নেই। রোধ নেই।

কিন্তু অনেক সময়ে পূর্ণ যৌবনেই লেখকের লেখার শান কমে যায়,

রূপ, রস, সবই শুকিয়ে আসে, ওজন হালকা হয়ে যায়। বাড়ে কেবল পৃষ্ঠার সংখ্যা, আর সেইসঙ্গে গ্রন্থমূল্য, এই ক্ষেত্রগুলিই রুগ্ন। এই পরিস্থিতির চিকিৎসা এখুনি দরকার, বাংলা সাহিত্যের দুর্দশা আটকানোর জন্য।

প্রথমে রোগ নির্ণয়। দেখতে হবে রোগটা কী? তারপরে রোগ-মুক্তির উপায়। তার জন্য দেখতে হবে রোগটা কেন? এবং সারবে কিসে? আমরা প্রায়ই নাক তুলে, ভুরু তুলে, ঠোঁট কুঁচকে বলি—"ওঃ, অমুকচন্দ্র তমুক? সে আবার লেখক নাকি? ও যখন ছিল, তখন ছিল। এখন যাচ্ছেতাই লিখছে। লষ্ট কেস্। গন্ উইথ্ দা উইণ্ড্!"

অথচ যখন ছিলেন তখন তিনি রীতিমত জাঁকজমক করেই ছিলেন। মাথায় রাজমুকুট, পদতলে ধরিত্রী নিয়ে। আর আজ তাঁর কেন এমন হলো? এই সেদিনও তাঁকে সভায় নিয়ে যেতে কী টানাটানিই পড়তো। এখন কেউ চায় না ওঁর সভাপতিত্ব। (অবশ্য অন্য কাউকে না পেলে আলাদা কথা!) সভায় এলে, অটোগ্রাফের জন্য ভিড় অবশ্য হবে, নেহাতই ইতিহাসের কারণে। কিন্তু তাঁর লেখা কেউ পড়ে না। কেন পড়বে? হয় রিপিটিটিভ, নয় তুচ্ছ। হয় আজেবাজে কণ্টেণ্ট, নয়তো হিজিবিজি স্টাইল।—"দূর দূর, ও আর লিখতে পারে না। লোকটা শেষ হয়ে গেছে।"

লোকেরা কেন শেষ হয়? কখনও কি আমরা নিজেদের প্রশ্ন করে দেখেছি?

কারণ তো অনেক থাকতে পারে—

এক: যদি লেখকটির জীবনবোধে, জীবনজিজ্ঞাসায় গভীরতা না থাকে, অল্পদিনেই তাঁর সৎশিল্প সৃজনের রসাধার, উৎসমূল শুষ্ক হয়ে

যেতে পারে। লেখা তখন খারাপ হবে।

উত্তর : এ রোগের দ্রুত আরোগ্যের ওষুধ নেই। এদের উচিত লেখা স্থগিত রাখা। যতদিন না অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ হচ্ছে, এবং বুকের ভিতর থেকে আপনি লেখার তাগিদ আসছে, ততদিন বিশ্রাম।

দুই : যদি লেখকটির অর্থ উপার্জনের কোনো দ্বিতীয় পন্থা না থাকে, তবে নেহাত ব্যবসায়িক কারণেই তাঁকে বিনা প্রেরণায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে হতে পারে, অন্যের তাগিদে। তাতে অনেক সময়ে লেখা খারাপ হয়। কিন্তু, অন্যের তাগিদে ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি, তুর্গেনিভ, চেখভ, শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসুরা লেখেন—এঁরা সাহিত্যজীবী শিল্পী। কিন্তু তাই বলে এঁদের রচনায় মান-অবনয়নের ঘটনা ঘটেনি। যাঁরা প্রথম শ্রেণীর সৃজনশীল লেখক, তাঁরা যে টাকার তাগিদেও প্রথম শ্রেণীরই লেখেন জগতে তার প্রমাণ যথেষ্ট। অবশ্য যদি তাঁদের হাতে লেখা তৈরির যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়।

সময়াভাবে লেখার অবনতি হওয়ার ঘটনা কিন্তু জগতে সবচেয়ে অবিরল। আর সময়াভাব তারই সবচেয়ে বেশি হয়, যে যত মিত্র-ভাবাপন্ন। মিশুক, নিরহংকার, সুশীল, লৌকিক সৌজন্যে বিশ্বাসী হলে অন্যেরা তার সময়ের আর দামই দেয় না। তাকে ব্যবহার করা হয় কেবল একটা জরুরি যোগাযোগের সূত্র হিসেবে। যত সামাজিকতা, লৌকিকতা, সভাসমিতি, পুরস্কার বিতরণী, সবেতেই কেবল ডাকাডাকি করা হয় তাকেই। যেহেতু সে যায়। আর সম্মানটা করা হয় আরেকজনকে, যে যায় না। সে থাকে হয় 'অহংকারী' নয় 'ব্যস্ত', 'অ্যাভেলেবল নন', ইত্যাদি প্রশংসা বাক্যে মোড়া। যে 'না' বলতে পারে না সেই হয় সস্তা লোক। তার যে মনে হয়—"এরা আমাকে এমন করে ভালবেসে ডাকছে, এত সাধ্য সাধনা করছে, না জানি

এদের কত অসুবিধা হবে যদি না যাই।" তার অনেকখানি সময় নষ্ট হবে যদিও, হাতের লেখাটা আটকে থাকবে যদিও, তবু প্রসাদ-ভিক্ষু ভদ্রলোক/ভদ্রমহিলাদের 'না' বলা বড় শক্ত।

এই 'না' বলতে না পেরে পেরে লেখক ক্রমশ তার নিজের জীবনটাকে অন্যের হাতে তুলে দেয়। দিনগুলো হয়ে যায় অন্যের। নিজস্ব থাকে কেবল রাত্রি। বিশ্রাম আর পরিশ্রমের মধ্যে তখন দড়ি-টানাটানি শুরু হয়। মেজাজ যায় বিগড়ে। স্বাস্থ্য পড়ে ঝিমিয়ে। যখন ঘুমোনো উচিত, তখন লেখা হয়। যখন লেখা উচিত, তখন চলে সভা-সমিতি লৌকিকতা ভদ্রতা অতিথি-আপ্যায়ন। এই অতিথিরা—যাঁরা আজ ভক্তের বেশে এসে সময় ধ্বংস করছেন—তাঁরাই পরে বিচারকের পরচুলো লাগিয়ে বলবেন—"সেন্টেন্‌সড্ টু ডেথ্।"

এই রোগটা নিরোধ করার উপায় আছে। উপায় হলো 'না' বলতে শেখা।

—কবিসম্মেলন ?—না।

—অফিসক্লাবের বার্ষিক উৎসব ?—না।

—ইস্কুলের পুরস্কার বিতরণী ?—না।

—গ্রন্থাগারের রজতজয়ন্তী ?—না।

—ব্যায়ামসমিতির সুবর্ণজয়ন্তী ?—না।

—কলেজের বির্তকসভা ?—না।

—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় কবিতা প্রতিযোগিতা ?—না।

—গল্প মেলা ?—না।

—কবিতা চক্র ?—না।

—ভাবসম্মেলন ?—না।

—সন্ত অমুকের মঠে তমুক উৎসবের উদ্বোধন ?—না।

—ছবির উদ্বোধন ?—না।

—নাটকের শততমরাত্রি ?—না।

দুটো আইন করে নিতে হবে ঃ

১। যত্রতত্র পুরোহিতগিরি চলবে না।

২। যত্রতত্র প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করা চলবে না

অন্যত্র অপ্রধান হয়ে থাকলে, তবেই স্বক্ষেত্রে প্রাধান্য রক্ষা করা সম্ভব।

আরেক সমস্যা সুভেনিরের লেখা। অন্যে টাকা করবে। তোমার নাম চাই। লেখা দাও। এদিকেও মুশকিল হয়েছে, না বললে কেউ শোনে না। "গ্রাম থেকে এসেছি" বললে 'না' বলা বেশ শক্ত। আবার 'হ্যাঁ' বলে ফেলবার পরের অংশটা হয় আরো কঠিন। ছাত্রদের 'না' বলা মুশকিল। নতুন লেখকদের 'না' বলা যায় না। লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে 'না' বলবে কোন্ পাষণ্ড ?

সুভেনিরে লেখা চাইলে আমার অবশ্য নীতিগত আপত্তি নেই। তবে লেখককে দু' মুঠো কবিদক্ষিণা অবশ্যই দেওয়া উচিত। সুভেনিরে অনেক টাকার বিজ্ঞাপন আসে। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের কথা অন্য। তাদের কাছে অবশ্যই টাকা চাইবেন না। তারাই ভবিষ্যৎ লেখককুলের আঁতুড়ঘর। গরীব-গরীব দেখতে কিছু ছেলের জীবনের প্রধান ঐশ্বর্য তারা। আবার সেই ছেলেরাও কালক্রমে স্বজাতির প্রধান ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে, এসবও প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু সুভেনিরটা ব্যবসায়িক কারণেই প্রকাশিত হয়। সেখানে প্রফেশনাল লেখকদের ফ্রী লেখা দেওয়া উচিত নয়। এইসব চাপে পড়ে লেখককে আজেবাজে লেখা লিখতেই হয়। লেখার মান উন্নত হল কিনা, তাতে সুভেনির্ কমিটির সদস্যরা ভাবিত নন। শুনতে দামী নাম কয়েকটা জড়ো করা গেল

কিনা—সেটাই প্রধান। লেখার ভালমন্দের দায়িত্ব তো যার নাম, তার। অমানুষিক তাড়া দিয়ে, অথবা অমানুষিক চাটুকারিতা দিয়ে লেখাটি যোগাড় করা পর্যন্তই কেবল স্মরণিকা-প্রস্তুতি কমিটির দায়।

কোনো সভা সমিতিতে শ্রমদান এবং সময়দান করাও লেখকের উচিত নয়। শ্রমদান করতে হলে, নাইটস্কুলে বিদ্যাদান কর। অযথা সভা সমিতিতে সময় দিয়ে নিরর্থক জ্ঞান দান করবে কেন? সে জ্ঞান কেউ নেয় না। ফেলে দেয়। তক্ষুনি ফেলে দেয়। দিয়ে, হালকা হয়ে, পরের আইটেমে, নাচে-গানে-নাটকে মনোনিবেশ করে। কবি-সাহিত্যিকদের কথা শুনবে বলে তারা আসেনি বরং বেশী কথা বললে হাততালি মেরে বসিয়ে দেবে বলেই এসেছে।

এইসব যাতায়াতে সাহিত্যিকের কী কী লাভ হয়? রসগোল্লা-চা-সিঙ্গাড়া, একপীস মালা, একটা চন্দনের ফোঁটা। কখনও মালার বদলে ঝাঁটার কাঠিতে গোঁজা কিছু ঝরাফুল। যার নাম 'ফুলের তোড়া', আর কখনও তোড়ার বদলে ঝাঁটার কাঠিতে গোঁজা এক-টুকরো ঝাউপাতার গায়ে আধখানা লালগোলাপ (গোরস্থান-থেকে-তুলে আনা অথবা ফুলের-বাজার-কুড়োনো) ঘুড়ির সুতোয় বাঁধা—যার বাংলা নাম 'বোকে' ইংরাজিতে বলে 'কর্সাজ'। এ ছাড়া লাভ: ধুলো, ক্লান্তি। খরচ: সময়, স্বাস্থ্য।

যদি বলেন, "কেন, মানসম্মান? সমাদর? শ্রদ্ধাভক্তি?" তাহলে বলবো—"ধুৎ তোর নিকুচি করেছে।" সভা শুরুর আগে অবধি সমাদর। আর সভার শেষে অনাদর। অনেক সময়ে ট্যাক্সিটাও ডেকে দেয় না। সমাদরের যুগটাই নেই। শ্রদ্ধার বদলে বড়দের শ্রাদ্ধটাই সহজ কাজ এবং অভ্যস্ত আচরণ। কবিতা লিখলে একমাত্র কবিরা ছাড়া কেউ ডাকে না, এই সুবিধাটা আছে। কিন্তু গল্প

লিখেছ কি মরেছ। সবাই ডাকে, ডাকে কিন্তু পোছে না।

—কেন পোছে না বলুন তো? আসল কথাটা কি জানেন? বিনা পয়সায় যা পাওয়া যায় তার কোনো দাম নেই বর্তমান জগতে। লেখাটা নিশ্চয় দেব, কিন্তু তার সঙ্গে কেন ব্যক্তিগত সময়টা দেব, বলতে পারেন? বেণীর সঙ্গে মাথা? ফ্রী সার্ভিসেস আর নট অ্যাপ্রিসিয়েটেড।

একজন গাইয়ে, সে যদি তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীও হয়, সভায় গান গাইতে এলেই কিছু দক্ষিণা নেবে। একজন প্রফেশনাল তবলচিকেও কিন্তু কদাচ ফ্রী আনতে পারবেন না। মাইকটা যে-ব্যক্তি ফিট করে দিচ্ছে, সে তার জন্য টাকা নেয়। থিয়েটারের অভিনেতাদের সাজাচ্ছে যে জন, সেও টাকা নেয়, যে স্টেজ বাঁধছে, সেও টাকা নেয়। যে চা মিষ্টি দিচ্ছে, সেও টাকা নেয়। যে ঝাঁটপাট দিচ্ছে, সেও। আর যিনি প্রায় ছ' ঘণ্টা ধরে সময় নষ্ট করলেন? একঘণ্টা যেতে, একঘণ্টা বক্তৃতা শুনতে, আধঘণ্টা বক্তৃতা দিতে, একঘণ্টা পুরস্কার বিলোতে, একঘণ্টা নাটক দেখতে, আধঘণ্টা চা খেতে, একঘণ্টা ফিরতে। তাঁর সার্ভিসটাই ফ্রী! তিনি সভাপতি। নয়ত প্রধান অতিথি, তাঁরা নমস্য ব্যক্তি। পয়সার প্রশ্ন ওঠে না, প্রশ্নটা প্রণামের। অথচ একঘণ্টা ধরে খাড়া দাঁড়িয়ে পুরস্কার বিতরণ কি সহজ পরিশ্রম? প্রকৃত অর্থেই ম্যানুয়াল লেবার। হাতেরই তো পরিশ্রম। অবশ্য পায়েরও। বক্তৃতা করাটাও প্রফেশনাল পরিশ্রম। আর অপরের বক্তৃতা শোনা তো আরো।

'না' বলার একটা সহজ পন্থা হচ্ছে 'ফী' স্থির করা। এবার থেকে গল্প কবিতা উপন্যাসের 'ফী'র মতো। লেখকরা যদি কবিসম্মেলন, অফিসক্লাব, কলেজ, পাঠচক্র, গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, সব-কিছুর জন্য নির্দিষ্ট দক্ষিণা ধার্য করেন, কবিতাপাঠ ৫০৲। সভাপতিত্ব,

২০০৲। প্রধান আতিথ্য, ১৫০৲। পুরস্কার বিতরণ আরও ১৫০৲। এ ছাড়াও পাঁচ টাকা ঘণ্টা হিসেবে সময়ের দাম উপরি চাই। যদি মধ্য-কলকাতার বাইরে যেতে হয় প্রতি ঘণ্টায় দশ টাকা।

তাহলেই লেখকদের মুক্তি মিলবে। লোকে টাকা দিয়ে লেখক ধরতে চাইবে না। ফিল্মস্টার চাইবে। জনমানসে টাকার সঙ্গে লেখকদের যোগ নেই। অতএব গ্ল্যামারের সঙ্গেও না।

এরপরে যদি লোকে টাকা দিয়েই লেখক ডেকে নিয়ে যেতে রাজী থাকে, অর্থাৎ লেখকদের সময়ের মূল্য ধরে দিয়ে, তাতে আপত্তির কারণ নেই। প্রফেশনাল সার্ভিস কেউ কখনো ফ্রী দেয় না, পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে। একমাত্র লেখকরাই দেন। সমাজেরও তাই তাঁদের কাছে এমন বেয়াড়া প্রত্যাশা। কিন্তু এ ব্যবস্থা ভাঙতে হবে।

এ জগতে যখন অর্থমূল্যেই সব কিছুর মূল্যায়ন ও মাননির্ণয় হচ্ছে, তখন লেখকদেরও সেই মূল্যেই সমাজের সামনে বাজিয়ে দেখতে হবে নিজেদের। বাজারদর গড়ে তুলতে হবে।

নতুন বণিক দুনিয়ায় পুরোনো দুনিয়ার জমিদারী আইনকানুন চালিয়ে, আর কতদিন এভাবে আমরা নিজেদের দীপ্তিহীন, বিবর্ণ ও খেলো করে ফেলবো? এই সব লৌকিকতা, সৌজন্যের শেষ ধাক্কাটা গিয়ে লাগে লেখায়। সাহিত্যচর্চায়। যারই জন্যে এত ডাকাডাকি, সেটাই হয়ে যায় গৌণ। যেমন-তেমন করে লিখে ফেলতে হয়।—হয়, তার কারণ কখনো সম্পাদকীয় তাগাদা, ডেডলাইন, ইত্যাদি—কখনো কারণ একসঙ্গে বেশি লিখতে বাধ্য হওয়া, "তৈল তণ্ডুল··· বস্ত্রেন্ধনচিন্তয়া",—কখনো কারণ, উপরোধে ঢেঁকি গেলা। চেনা মানুষের পরিচয়পত্র নিয়ে চলে আসেন মিটিং-সন্ধানী মানুষেরা। সভার জন্য কেড়ে নিয়ে যান লেখকের অমূল্য সময়।

এতেই লেখা অধঃপতিত হয়। এই পতন রুখতে হবে। আত্ম-রক্ষার জন্য লেখকদের উচিত অর্থমূল্য দাবী করা। এতে কিছুটা অত্যচার কমবে—চাহিদার গুরুত্বটাও বোঝা যাবে। পশ্চিমে এই কবিতাপাঠ, আর সভাপতিত্ব, আর বক্তৃতাদানের জন্য দক্ষিণা দেওয়া একশো বছর ধরেই চালু। এ দেশে আবৃত্তিকারেরা যাঁদের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে দক্ষিণা নিয়ে বাড়ী যান—সেই কবিরা তাঁদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শূন্যহাতে ফেরেন।

বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ, অযৌক্তিক। এর সংশোধন দরকার।

ভালো লেখার জন্য যথেষ্ট প্র্যাকটিক্যাল ইন্‌সেনটিভ আমরা যোগাতে পারি না। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কোনো কাজ করতে গেলে তার জন্য ইন্‌সেন্‌টিভ লাগে। শিল্প কেবল শিল্পের জন্যই হয়, যদি সরকার শিল্পীকে রাজনীতিক মত নিরপেক্ষ হয়ে ভরণ পোষণ করেন। সে ঘটনা এখনো জগতে কোথাও ঘটেনি। কোথাও কোনো সরকার নিরপেক্ষ হতে শেখেননি। যদি দেন একহাতে অর্থ, অন্য হাতে চাইবেন বিশ্বস্ততা। সৎ সমালোচনা নয়। বিরুদ্ধ মন্তব্য নয়। অতএব সৎ সাহিত্যসৃষ্টি সরকারী পোষণে কোথাও সম্ভব হবে বলে এখনও মনে হয় না।

তাই একমাত্র পাঠকদেরই সহায় হতে হবে। লেখকের বন্ধু বলুন, সচিব বলুন, বল ভরসা বলুন, সবই তো পাঠক। পাঠক যদি স্নেহভরে মমতাভরে লেখককে তাঁর আত্মশক্তি পুনরুন্নয়নের জন্য সময় ও সুযোগ করে দেন, তবেই ভালো লেখক ভালো লিখতে পারবেন। তাঁকে বেশি লিখতে বলা উচিত নয়, তাঁকে অকাজে অজায়গায় ডেকে তাঁর সাধনার বিঘ্ন ঘটানো উচিত নয়। ভালো লেখার জন্যে

চাই অন্তর্মুখীনতা। আত্মার অধিকার হারিয়ে ফেললে লেখা ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

সদাউন্মুক্ত চোখ থাকবে বাইরে, সদাজাগ্রত মন কাজ করবে ভিতরে ভিতরে, তবে তো লেখা কলমে ফুটবে? হৃদয়ে বিদ্ধ হবে?

এ দেশে এত মৃত্যু এত ক্ষিধে এত প্রেমিক এত কবি এত লিট্‌ল ম্যাগাজিন এত বোমাবাজি এত কান্না যে সব মিলিয়ে একটা জটিল অকরুণ উজ্জ্বলতায় জীবনে সদাই সঙ্কটমুহূর্তের লাল আলো জ্বলছে।

এর মধ্যেই ভালো লেখা হয়। সব চেয়ে ভালো লেখা এখানেই জন্ম নেয়। কিন্তু চাই আত্মানুসন্ধানের অবকাশ। চাই আত্মানুশীলনের অবকাশ। চাই আত্মাবলোকনের অবকাশ। চাই দক্ষিণের বারান্দায় আকাশের নিচে একা, একদম একা, স্থির, ধ্যানস্থ হয়ে থাকা।

সহৃদয় হৃদয়-সংবেদী পাঠকরা সাহিত্যের ভালো চাইলে, লেখকদের ভালোবাসতে চাইলে, সেই সুযোগ করে দিন। (ধনীদের নিয়ে এসে সভাপতিত্ব করান, আর গুণীদের জন্য চাঁদা তুলুন!)

বই মেলা ঃ মেলা বই

বই মেলায় একগাদা লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেরোয়, একগাদা স্পেশাল বইও বেরোয় এ কথা কে না জানে?—শুনলে মনে হয় খুব সোজা। কিন্তু একটা বই বের করা কি সোজা কাজ নাকি মশাই? লিট্‌ল ম্যাগাজিন ওই নামেই যা লিট্‌ল, পরিশ্রম প্রচুর হয়। আর জটিলতাও প্রচুর। প্রথমেই তো প্রবচন থেকেই জটিলতা ধরা পড়ছে, দেখুন—"ধনীজনে কেনে বই, গুণীজনে পড়ে।" যে কেনে সে পড়ে না, যে পড়ে সে কেনে না। ক্রেতা মানেই পাঠক নয়। পাঠক মানেই ক্রেতা নয়। 'সংগ্রাহক' বলা যেতে পারে বরং। যাই হোক পত্রিকা যখন বের করে তখন আপনাদের দু'দলের কথাই তো মাথায় রাখতে হয় আমাদের? তাছাড়া বই মেলাটা কাদের মেলা? ক্রেতাদের, না বিক্রেতাদের? নানান মৌলিক দার্শনিক সমস্যা আছে মশাই। বই বের করা অত সোজা নয়।

যে দিকে চাইবেন, টাকার খেলা মশাই। কেবল টাকা, টাকা, টাকা। সবাই হাঁ হাঁ করছে। প্রথমে যোগাড় কর কাগজ তায় ভাল প্রিণ্টার্স, যাদের আস্ত আস্ত হরফ আছে, সবগুলো রেফ্‌ তালব্য শ, যুক্তাক্ষর ইত্যাদি আছে, ভাল কম্পোজিটার আছে, ভাল কালি আছে। তারপর চাই প্রুফরীডার, যার হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ জ্ঞান আছে, তারপর ছাপার পরে তো বাঁধাই, ভাল আঠা চাই, ভাল সুতো চাই, ভাল দপ্তরী চাই। আবার ওদিকে কভারের ব্যাপার আছে, আর্টিষ্ট

চাই। চাই ব্লকের মিস্ত্রি। কভার প্রিন্টিংয়ের যোগ্য ছাপাখানা আবার সবাই নয়। এর পর আপনার গিয়ে প্রকাশক চাই। বই মুদ্রিত হলেই তো হলো না? প্রকাশিত হওয়াও যথেষ্ট নয়, চাই ডিস্ট্রিবিউটার—বিক্রেতা চাই। তারপরে চাই আপনাকে।

ক্রেতা। উপরোক্ত ব্যক্তিরা সবাই জরুরি, তবে সবচেয়ে জরুরি হলেন আপনি। আপনার জন্যেই সব। আপনি হলেন লক্ষ্মী। আপনার জন্যেই তো আজ এই বই-মেলা। আপনার জন্যেই এই সব র‍্যাকভর্তি সার সার বই আর মাঠে এইসব লিটল ম্যাগাজিনের ব্যাকুল আত্মদান। আপনিই এই উত্তেজনার মূল নায়ক, অথবা নায়িকা। আপনার মনোরঞ্জনের জন্যই উপরোক্ত এতগুলি ব্যক্তি দিবারাত্র পরিশ্রম করছেন, এই শীতের ভোর বেলায় ঠাণ্ডা জলে চান করে এক ভাঁড় চা-পাঁউরুটি খেয়েই দ্রুত কাজে বসে বা ঘেমে কেউ কেউ লোড শেডিঙে ম্লান মোম বাতি জ্বেলে মাইনাস দশ পাওয়ার চশমায় প্রুফ দেখছেন কেউ, কেউ কেউ সারারাতই টকাটক্ চালাচ্ছেন। কেউ দিনভর অঙ্ক কষছেন লাভ-ক্ষতির। কেউ বা লাইন লাগিয়ে আছেন কোটার বইয়ের কাগজ যোগাড় করতে, কেউ কেউ একে ওকে বিজ্ঞাপনটা, লেখাটা, কাগজটা তৈল প্রদান করছেন, এটা-ওটা গুছিয়ে নেবার জন্যে। সকলেরই মূল উদ্দেশ্য এক। আপনার মনের তুষ্টিবিধান।

ওঃ হো। আরেকজনের কথা বলা ভুলে ভুলে বাদই পড়ে গেছে। সে বিশেষ জরুরি নয় অবিশ্যি। মনে থাকবে কি করে? এই যে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের যখন বিল শোধবার সময় হবে, তখন তার নামটা কোথাও থাকবে না। কাগজের দাম দিতে হবে। ছাপার দাম দিতে হবে, ব্লকের দাম দিতে হবে, বাঁধাইয়ের দাম দিতে হবে। ষ্টলের ভাড়া

দিতে হবে—ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন দিলেও, তার দামও তো শোধ দিতেই হবে?—এতসব দিয়ে থুয়ে আর হাতে থাকে কী বলুন? বই বের করা কি সোজা ব্যাপার? ওফ্। বইমেলার সময়ে স্পেশাল বই বের করে দেখুন না একটা? আরে মশাই লেখা যোগাড় করাই তো একটা যাচ্ছেতাই কাজ। বড় বড় লেখক, মানে প্রোফেশনাল রাইটাররা, যাঁদের নাম দু'চারটে না থাকলে বই আপনাদের গছানো যাবে না, তাঁরা যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেন। প্রথমে মিষ্টি হেসে পঞ্চাশবার ঘোরান, তারপর হয় আগে ছাপা হয়েছে এমন কোনো লেখা দেন, নইলে যা তা কিছু বাঁহাত দিয়ে লিখে দেন। অথচ সেটাই আপনারা চান—কেবল নিজেদের লেখা দিয়েই বই করলে তো আপনারা কিনবেন না। চেনা নামটাই আপনাদের কাছে আসল, লেখার কোয়ালিটিটা নয়। ভালো লেখা কি আপনারা বোঝেন মশাই? বুঝতেন যদি, তাহলে আমাদের আর 'বড়' লেখকদের পেছনে বৃথা ছুটে সময় নষ্ট করতে হত না। তবে হ্যাঁ, ওই লেখাটাই যা এখনো ফ্রী আছে। ওইটুকুই রক্ষে। ছাপা বাঁধাইয়ের এই বিপুল খরচ খরচা মিটিয়ে আবার যদি লেখার পেছনেও খরচা করতে হতো, তাহলে কি আর পারা যেত? লেখাটাই এখনো যা ফ্রী অব কস্ট, আর সবই বড্ড কস্টলি হয়ে গেছে মশাই!—

[পুনশ্চ: তবে হ্যাঁ, লিটল ম্যাগের সম্পাদক মশাই যেমন জানেন, লেখককে পয়সা দিতে হবে না, ওটা ফ্রী। বাজারের ষ্টল মালিকেরাও তেমনিই জানেন, লিটল ম্যাগের সম্পাদককে বই বিক্রির পয়সা দিতে হবে না। ওটা উপরি। মজাটা তো সেইখানেই!]

গল্পের খোঁজে

কে বলেছে গল্পকারদের ধাইতে হয় গল্পের খোঁজে? অন্তত আমাদের মতো গোপ্পে লোকদের তো নৈব নৈব চ। গল্পই বরং তাড়া করে বেড়ায় আমার পেছু পেছু। সব ক'টাকে বাগ মানিয়ে লিখে ফেলতে পারি না। আমি তো দেখি জীবনের নব্বুই ভাগটাই—'ঠিক যেন গল্পের মত'—আজগুবি, অঘটনের মালা। অথচ নিছক সত্যি কথা বললে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। গল্প লিখতে হলে খানিকটা মিথ্যের ভেজাল মিশিয়ে সত্যকে প্রথমে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়, তবে তো 'পাবলিক' নেবে? এদিকে আমার আবার কল্পনাশক্তিটা খুব কম। জীবন যে-রকম, সে-রকম লেখার জন্যে নির্ভেজাল সত্যি লিখলেই তো চলবে না, সত্য ঘটনা বললেই অমনি বিশ্বাস করে নেবে এমন বোকা পাঠক জগতে আজকাল বড়ো দুর্লভ। 'সব সত্যিকথা সব সময়ে সব লোককে' কিছুতেই বিশ্বাস করানো যাবে না,—কেননা সবাই আজকাল সংশয়বাদী। অবিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে যাই বলুক লোকে প্রথমেই ধরে নেয় মিথ্যে কথা বলছে। তাই আমাকে গল্প খুঁজতে হয় না। স্রেফ সত্যি কথাগুলো লিখে ফেললেই হলো—ভালো লোকে বলেন —আহা কী সুন্দর অ্যাবসার্ড ইম্যাজিনেশন! আর মন্দলোকে বলেন —দূর! যত্তো আজগুবি গুলতাপ্পি মেরেছে! যিনি যাই বলুন, সবাই মেনে নেন যে গল্প লিখেছি!

জীবনের মতো আজগুবি আর কী আছে? আমার কাছে সব ঘটনাই অঘটনের মতো বিশিষ্ট লাগে। আমি নিজেই এমনি একটি অঘটন। আমি তো দেখি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে লজিক নেই, কেবল গল্প আছে। আপনারা যাই ভাবুন আমি যে সত্যি সত্যিই চামচিকের বাচ্চা কুড়িয়ে পাই, একবার নয় দু'বার—ম্যাটারহর্ন পর্বতশিখর অভিযানে বেরিয়ে পা পিছলে আলুর দম হয়ে ভয়ংকর মুরগীদের খাঁচায় ঢুকে যাই, নিরস্ত্র—হুমদো হুলোরা দেখেশুনে আমারই কার্নিশে এসে আটকা পড়ে, সেই হুলো বন্দী উদ্ধার করতে আমায় দমকল ডাকতে হয়,—ফোন তুলে বখাটে ছেলে ভেবে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের ভুলে ভুলে বকুনি দিয়ে ফেলি, সেও অধম আমিই—বিয়েবাড়িতে সবাই যায়, সেখানে মেসোমশাইয়ের কীর্তিকলাপ পড়ার তো পড় আমারই চোখে পড়ে যায়, হায়দ্রাবাদে সভা করতে গিয়ে হঠাৎ প্রয়াগে হাজির হই—টানা ট্যাক্সিভাড়া করে কুম্ভমেলায়! সেখানে পৌঁছে একা একা পথেঘাটে শুয়ে থাকি, আর ঠিক আসল সময়ে জুতো মোজা পরেই স্নানটা সেরে ফেলি—এসবই তো দ্য ট্রুথ, দ্য হোল ট্রুথ এ্যাণ্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ। এসব সরল সত্য যখনই লিখেছি, আপনারা মুচকে হেসেছেন, বলেছেন—জানা আছে। এই জন্যেই তো বাকীগুলো আর লিখছি না।

এই যে সেদিন গত বছর আসামে সাহিত্যসভা করতে গিয়ে হঠাৎ বদ্ খেয়াল হলো—আচ্ছা, যুদ্ধ করতে চীনেরা কী পথে তেজপুরে এসেছিল? দেখি তো? সেই সুযোগে তাওয়াং গুমফাও বেশ দেখা হয়ে যাবে! সেই দেখতে একা একা ট্রাকের পর ট্রাকে ঠাঁই বদলে হিচ হাইক করেছি নেফার দুর্গম পাহাড়ে। চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু সে-লা পাস পেরিয়ে, চিরবরফের রাজ্য নাবুয়ানাং চিরযৌবনের দেশ

"শাংগ্রি-লা" পেরিয়ে লস্ট (লস্ট হরাইজন মনে আছে নিশ্চয়ই?) ম্যাকমাহন লাইন থেকে মাত্র দশবারো কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে পৌঁছে—মোমপা উপজাতিদের কুটিরে বসবাস করে, ভারতের বৃহত্তম গুমফাটি দেখে চীনেদের দশদিনে তৈরি করা রাস্তায় বেড়িয়ে চমরীর মাংস আর নুনমাখনের বীভৎস চা খেয়ে মোটা হয়ে বাড়িতে ঢোকবামাত্র কর্ণকুহরে প্রচুর বকুনি, মাথায় ফ্লিট আর সর্বাঙ্গে ডেটল পানি ছিটিয়ে আমাকে রিসিভ করা হল! সেসব ভয়াল রোমহর্ষক কাহিনী আমি তো লিখিইনি মোটে। পাছে সম্পাদকরা বিশ্বাস না করেন। তবে সুখের কথা এই যে আসমুদ্রহিমালয় ভারতবর্ষে এতটুকু প্রিভেসির স্কোপ নেই। প্রাণ চাক আর নাই চাক, সর্বত্র সর্বাবস্থায় পাপেই বলুন, আর পুণ্যেই বলুন, আর পাগলামিতেই বলুন আপনার সাক্ষী-সাবুদের অভাব হবে না। একেবারে অপ্রত্যাশিত কোণেও হাতে-নাতে সাক্ষী প্রমাণ মজুত থাকবেই থাকবে। এঁরা না থাকলে আপনারা এতদিনে আমাকে টেনিদিদি কিম্বা ঘনা বৌদি আখ্যা দিয়ে ফেলতেন। অথচ আমি কিন্তু কদাচ গল্পের খোঁজে ছুটি না। আমি ছুটে বেড়াই জীবনের এলোমেলো তাগিদে, বাঁচার খুশিতে।

আমার জীবনটা মাঝে মাঝে সত্যি সত্যিই গল্পের বইয়ের মতো দারুণ ইন্টারেস্টিং হয়ে যায়। কখনো আবার ডিকটেশন স্পীডে খবর বলার মতো নিদারুণ বোরিং হতে থাকে। লেখাও যে সঙ্গে সঙ্গে তদ্ভাবে ভাবিত হয়, বলাই বাহুল্য!

লেখার জন্যে তো মানুষের জীবনের মাপজোক বদলাবে না, জীবনেরই কাটছাঁট অনুযায়ী লেখা তৈরি হবে। কিন্তু কারুর বেলায় উল্টোপাল্টাও যে হয় না, তা নয়। প্রমথ চৌধুরী তাঁর নীললোহিতের

গুলগুলোকে বলেছিলেন—'কল্পনার সত্য'। তাঁর নায়ক নীললোহিত যেই বিয়ে-থা করে সত্যবাদী গেরস্থ-পোষা হয়ে গেল, অমনি তার গল্পের নটেগাছটিও মুড়োলো। কিন্তু তার গল্পগুলো যে বাস্তবের সত্যই তার প্রমাণ এই সেদিনই মিলেছে, প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে। কাগজে সবাই পড়েছেন আপনাদের পরিচিত গুম্ফশোভিত এক প্রধানমন্ত্রী গ্রামবাসীদের ধোলাই এড়াতে কীভাবে শাড়ি পরে পিট-টান দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর নীললোহিতও কিন্তু হুবহু এইভাবে মারমুখী গ্রামবাসীদের হাত এড়াতে এক বিধবার ধুতিটা পরে নিয়ে পালিয়েছিল। এখন কোনটা সত্যি কোনটা কল্পনা? খবরের কাগজের খবরটা? না নীললোহিতের গুলটা? নাকি দুটোই এক? ভাগ্যিস মন্ত্রীমশাইয়ের প্রমথ চৌধুরী পড়া ছিল! গল্পই কেবল জীবন থেকে মালমশলা নেয় না, তার মানে জীবনও মাঝে মধ্যে গল্প থেকে রসদ সংগ্রহ করে! জীবনের ভানুমতীর খেল্ কিন্তু অফুরন্ত! মানুষ যে কত রকমের! মেসোমশাই একরকম, রঞ্জনের বসন্তমামা আর একরকম, আবার জগমোহনবাবুও তো সত্য ঘটনাই? এক রবিবার দুপুরে কাকার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখি পাশের বাড়ির পাঁচিলে উঠে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গভীর মনোনিবেশ সহকারে একটি লম্বা বাঁশ নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাকার দোতলার জানলার কাঁচ ভাঙছেন! রাস্তার দর্শকবৃন্দ স্তব্ধ, নীরব সাক্ষী। কাকার বাড়িতেও আপত্তির চিহ্ন নেই। কিছু বোঝার আগেই নিরেট নবনীতা পেল্লায় চেঁচিয়ে উঠেছে—"অ কাকিমা! কী করছো তোমরা? তোমাদের জানলা-টানলা সব যে ভেঙে ফেললেন ইনি।"

সেই চীৎকারে কাকিমা দৌড়ে বারান্দায় এলেন, চোখে অপার বিস্ময়, দু হাতে মাখা ময়দার তাল—বেরিয়ে কাকিমা ফ্রিজ শট্!

তারপরে ক্রমশ প্রকাশ্য পদ্ধতিতে যা যা জানা গেল, তাতে ওই বৃদ্ধ জগমোহনবাবুর জগৎটা নিয়ে দিব্যি একটা আজগুবি গপ্পো তৈরি হয়ে যায়। আর রঞ্জনের বসন্তমামা? তাঁর তো আপাদমস্তক গল্পে-মোড়া! গল্প হয়েই তাঁর জন্ম।

কিম্বা এই সেদিন, কবি প্রাণবিন্দুবাবুর মেজ আঙুলে যে ন'টা স্টিচ দিতে হয়েছে। ব্যাপার কী? কবি বললেন—"কিছুই না, মানে আমাদের খরগোশটা হঠাৎ একটু কামড়ে…"

এখন এই হিংস্র খরগোশের কীর্তিকলাপ যদি লিখি আপনারা বলবেন গাঁজাখুরী।—হে বন্ধু হোরেশিও শুনে রাখুন, এই স্বর্গ মর্তে অনেক কিছুই ঘটে, যা তর্কে বহু দূর।

ধরুন গত ২১শে মে, সকালে টালিগঞ্জ থানায় যেটা ঘটলো। আমাদের ফাই-ফরমাশের বালিকাটি না-বলিয়া মা'র ব্যাগ থেকে উনিশ টাকা বারো আনা নিয়ে উধাও হয়েছে। সমস্যা উনিশ টাকা নয়, সে নিজেই। অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে আরতি। এই দুরন্ত শহরে কে জানে কোথায় জন্মের মতো উবে যাবে? ভয়ানক দুশ্চিন্তায় টালিগঞ্জ থানায় ফোন করলুম।

কথাবার্তাটা এইরকম হলো:

॥ পুলিশ: প্রশ্ন ॥

১। নাম?

২। হুম্। বয়েস?

৩। হুহুম্। দেশ?

৪। পরনে নীল ফ্রক?

৫। ছিটের প্যাণ্ট?

৬। ঘাড় অবধি ঝাঁকড়া চুল ?

৭। রং কালো ?

৮। আপনার নাম কি ডাক্তার সেন ? আপনার বাড়িতে ফাই-ফরমাস খাটে ?

৯। (মৃদুহাস্য) ও-সব আমাদের জানতে হয়। ও কিছু নয়। হ্যাঁ আরতি জমা পড়েছে। এসে নিয়ে যান।

॥ আমি : উত্তর ॥

১। আরতি।

২। দশ-বারো হবে।

৩। মেদিনীপুর।

৪। আজ্ঞে হ্যাঁ, নীল ফ্রক ! [বলেই আমি অবাক ! ওরা জানলো কী করে ?]

৫। হ্যাঁ হ্যাঁ ছিটের প্যাণ্ট। [কী আশ্চর্য !]

৬। ঠিক তাই ! ঠিক ! [অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি।]

৭। খুব কালো।

৮। কী আশ্চর্য—আপনি এতসব জানলেন কেমন করে ?

৯। আহ্। বাঁচালেন ! দাঁড়ান—এক্ষুনি চলে আসছি। পাঁচ মিনিট ! অনেক অনেক ধন্যবাদ !

'জয় জগদীশ হরে' বলে ছুটলুম। দু' বগলে দুই মেয়ে নিয়ে টালিগঞ্জ থানাতে। থানায় ঢুকতেই পুলিশমশাই হাঁকলেন—আরতি। অমনি 'এঁজ্ঞে' বলে লাফাতে লাফাতে যে উপস্থিত হলো, পরনে নীল ফ্রক, রং কালো, ঝাঁকড়া চুল, বয়স দশ বারো, দেশ মেদিনীপুর —সে মেয়েকে আমি আগে কোনোদিন দেখিনি।

এবারে পুলিশ অফিসারেরই চমকে যাবার পালা।—"বলেন কি? এ মেয়ে নয়? ঠিক বলছেন?" পুলিশ বাক্‌রহিত হয়ে যান। তারপর দু-জনে কোরাসে গাই—"ক্‌কী আ-শ-চ-র্য। সেনটা পর্যন্ত মিলে গিয়েছিল?" এইখানে একটা হিন্দি সিনেমার গল্প শুরু করা যেত না কি? মিসটেক্‌ন্‌ আইডেনটিটির জমজমাট একটা চিত্রনাট্য লিখে ফেলা যেত। অথবা "দ্য ডাব্‌ল" ধরনের দারুণ একটা ডস্টয়েভস্কিয়ান থীমের বড় গল্প? আধুনিক আইডেনটিটি ক্রাইসিস? আমি অবশ্য সেসব না করে ভবানীপুরস্থ বালিগঞ্জ থানায় ছুটলাম "মিসিং পার্সেনসে" ডায়েরি করাতে (নম্বর GDE 2380)।

এছাড়া আমাদের বাড়ির সামনে একটা আস্ত গল্পের নলকূপই আছে। ঘটাং ঘটাং করে দিনভর ওখান থেকে গল্পের বীজ উঠে আসে বালতি বালতি। যথা, ঝি বনাম 'ভারী'র কথোপকথন।

ভারী: আজ তুমকো বহুৎ পানি লাগতা হ্যায়?

ঝি: হ্যাঁ, কত্তা মৈরা গেচে কিনা কাল রেতে।

ভারী: চুক্‌ চুক্‌। কোঈ মরনেসে পানি কিঁউ জেয়াদা লাগেগা?

ঝি: গিন্নিমাকে ছুঁচিবাঈতে ধইরেচে যে। কত্তার ঘরটা কেবল ফেনাইল দে ধুইতেচে, কলসী কলসী জল ঢালতেচে, আর আপদ বিদেয়! মহাপাপ বিদেয়! জয় জগবন্ধু! বৈলে চেল্লাতে নেগেচে!

ভারী: হায় রাম! কেয়া তাজ্জবকি বাত! ছিয়া! ছিয়া!

এই রকম শত শত। ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কত চাই?

এই বীজটুকু মুঠোয় পেলেই যে-কোনো শক্তিমান গল্পকারের ক্ষেত্রে একটা 'মেটামরফসিস' কি মাল্যবান জাতীয় নিদারুণ গল্প

গজিয়ে যেত কিনা বলুন? নেহাৎ ছা-পোষা আমি বলেই তাই পেরে উঠি না। এই তো এতগুলো গল্পের খোঁজ দিলুম। এবার মহামান্য পাবলিক যদি অভয় দ্যান তো এর কয়েকটা চুপি চুপি লিখে ফেলি। নইলে নির্ঘাৎ অন্য কেউ লিখে ফেলবেন। সামনেই আবার পুজোর মরশুম কিনা। প্রত্যেকেই ছিপ ফেলে বসে আছি!

পাই-রো-অমিক্রন-ডেলটা-ওমেগা-সিগমা
মিউ-ইয়টা-টাউ-রো-অমিক্রন
ওরফে
ফাই-এপসিলন-লামডা-উপসিলন
ডেলটা-আলফা
ভের্সাস
আমরা

প্রশ্ন : (১) গোবিন্দের বিন্দ খেলো বয়েলগাড়ির বল
(২) মন্দার ফুল মরে গেল নাম কী আমার বল্ ?

এইরকম সংকেত-টংকেত দিয়ে আরম্ভ করাটা আসলে একটা কায়দা। ওতে পাঠককে সুড়সুড়ি দেবে, ফেলুদা বলেছে, ওটা গোড়াতে দিলে যারা পড়বে তারা প্রথম থেকেই মাথা খাটাতে পারবে। অবিশ্যি এই হেঁয়ালিটা অতি সোজা। শিরোনামটা তো মোটে হেঁয়ালিই নয়, স্পষ্ট গ্রীক অক্ষরে লেখা বাংলা নাম। অবশ্য ইংরিজি বানানে। ফেলুদা যেমন করে ডায়েরি লেখে আর কি। আর প্রশ্নটা হেঁয়ালি বটে তবে খুবই সোজা। এটা সব্বাই ধরতে পারবে। ওপরের দুলাইন তো শুরু, আরো আছে। এই যে দিচ্ছি সবটা নিচে। পুরোটাই ভীষণ সোজা। ফেলু-সাহিত্য যে পড়েছে সে-ই ধরে ফেলবে। ওয়াটারি লিকুইড একদম। জলবৎ তরলম্। এত সোজা

যে, জটায়ুর মত বলবে—ছঃ !

(৩) পিতৃষ্বসা বন্ধু আছি
(৪) ডাইনে আগুন বাঁয়ে হাঁচি
(৫) যোগ-বিয়োগে কুংফু কাঁচি
(৬) আল্‌ফা-বিটায় সব্যসাচী
(৭) বীর দ্বিজ আর তপস্বী মাছ
(৮) সায়ং শশীর হাত ধরে নাচ
(৯) সন্ধ্যে-চাঁদার কলসী গাদা
(১০) মাথায় কাটি গোলকধাঁধা
(১১) যাও না—আধা আধেক দাদা
(১২) আকাশ-জলের মধ্যে বাঁধা

পিকোলো এখন হাইস্কুলে পড়ে, সে খানিকক্ষণ পরে মন্তব্য করলো—"ওহো বুঝেছি, বুঝেছি"—তারপর, "এই নাও—উত্তর" বলে নিজেই আর একটা হেঁয়ালি লিখে দিলো নিচে।

পিকোর উত্তর ঃ

ব্রাদার আমার পাশ করোনি
ফাঁস করেছো সব—
+ উ দাদা, থামাও কলরব।

কী : তোমরাও উত্তর পেয়ে গেছো, না ?

টুম্পাটা এখনো ছোট, জুনিয়ার স্কুলে পড়ে, গ্রীক সিম্বল-টিম্বল জানে না। যদিও খুব মন দিয়ে ফেলুদা পড়ে, এবং "ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন একটু জিরো"র মতো ভালো জিনিস ও নাকি জীবনে পড়েনি। ও বললো, "না, এখনও সবটা বুঝিনি। আর একটু ভাবতে দাও।" তখন একটা সূত্র দিলুম টুম্পাকে—এবং কী আশ্চর্য, সূত্রটা সে ঠিকই ধরে

ফেলতে পারলে। আর সেই সূতো ধরে টেনে আনলে পুরো হেঁয়ালিটাই। কিন্তু সেই সূত্রটা তোমাদের এখুনি দেবো না। 'সব শেষে!

পিকোলোর সঙ্গে কনসাল্ট করে নিয়ে, টুম্পা একটা কাগজে উত্তরগুলো ফাইনাল লিখে, আমাকে দিয়েছে। এইবার সেই সমাধানের কাগজটা তোমাদের দেখাচ্ছি—পিকো তো উঁচু ক্লাসের অঙ্ক কষে, গ্রীক সিম্বলগুলো তার অনেকটাই জানা আছে। বাকীটা স্রেফ আন্দাজীফাই করেছে।

(ক) ॥ শিরোনাম ॥

পাই + রো + অমিক্রন = প্র, ডেলটা + ওমেগা = দো, সিগমা = ষ, মিউ + ইয়টা = মি, টাউ + রো + অমিক্রন = ত্র = প্রদোষ মিত্র।

ফাই + এপসিলন = ফে, লামডা + উপসিলন = লু, ডেলটা + আলফা = দা = ফেলুদা

(খ) ॥ প্রশ্ন ॥

(১) গোবিন্দের—'বিন্দ' গেল = গো রইল
বয়েলগাড়ির 'ব—ল' = য়ে রইল

(২) মন্দার ফুল 'মরে' গেল, ম—র = ন্দা রইল = গোয়েন্দা

(৩) পিতৃষ্বসা = পিসি = P. C.
বন্ধু = মিত্র = পি. সি. মিত্র
(নাম কী আমার বল ?)

(৪) ডাইনে আগুন = ডান পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র = পিস্তল
বাঁয়ে হাঁচি = বাঁ পকেটে ব্রহ্মাস্ত্র = গোল মরিচের গুঁড়ো = হাঁচি (কার থাকে ? ফেলুদার)

(৫) যোগ বিয়োগে কুংফু-কাঁচি=নিয়মিত যোগাসন অভ্যাস করা ছাড়াও কুংফুর কাঁচি-ল্যাং-লাথির কায়দাটা প্র্যাকটিস করে ফেলেছে (এনটার দ্য ড্রাগন দেখার পর থেকে) (কে ? ফেলুদা)

(৬) আল্‌ফা-বিটায়=গ্রীক হরফে ডায়েরি লেখে ; সব্যসাচী=ডান বাঁ দু হাতেই অনায়াসে লিখতে পারে তাই সে সব্যসাচী (কে ? ফেলুদা)

(৭) বীর দ্বিজ আর তপস্বী মাছ—

দ্বিজ=যে দুবার জন্মায়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, আর পাখী।

বীর দ্বিজ=বীর পাখী, বীর ব্রাহ্মণ=বীর পাখী=জটায়ু

(বীর বামুন=লালমোহন গাঙ্গুলী)

তপস্বী মাছ=তোপ্‌সে।

অনেক গোঁফ দাড়ি আছে, জটাজুটওলা মাছ বলে তোপ্‌সে মাছের ভাল নাম আসলে তপস্বী মৎস্য।

(৮) সায়ং মানে সন্ধ্যে=প্রদোষ

শশী মানে চাঁদ=চন্দ্র

(৯) সন্ধ্যে-চাঁদার=প্রদোষ চন্দ্রের

কলসী গাদা=কুম্ভ রাশি

(কার ? ফেলুদার)

(১০) মাথায় কাটি ইত্যাদি=বুদ্ধি দিয়ে রহস্যের সমাধান করে (কে ? ফেলুদা)

(১১) যাও=Go=গো, না=আধা=No থেকে o বাদ=N=এন্, আধেক—দাদা=দাদা থেকে একটা দা বাদ=দা=গোএনদা।

(১২) আকাশ-জলের মধ্যে বাঁধা = আকাশে জটায়ু পাখি,
জলে তোপ্‌সে মাছ, মধ্যে মাটি জুড়ে কে ? ফেলুদা !
পিকোর হেঁয়ালি মন্তব্যটাও টুম্পা দেখলুম সল্‌ভ্‌ করে দিয়েছে—
ব্রাদার আমার পাশ করোনি = ফেল
ফাঁস করেছো সব = রহস্য উন্মোচন করাই গোয়েন্দার কর্তব্য।
+ উ দাদা থামাও কলরব = ফেল্‌ + উ দাদা = ফেলুদাদা !

পিকো-টুম্পা তো ফেলুদা-হেঁয়ালিগুলো সল্‌ভ্‌ করে ফেলে নতুন "সন্দেশ" চাখতে শুরু করে দিলো। আর আমার মনে হলো সত্যি, ফেলুদা এণ্ড কোং-এর মতো অমন টীম আর জগতে দুটি দেখলুম না! বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক, ব্যোমকেশ-অজিত, হোম্‌স-ওয়াটসন— সর্বত্রই, যে সহকারী, বয়সে যুবক হলেও তার ভূমিকাটা নামে মাত্র। কার্যত প্রায় অপরিণত বয়স্ক বালকেরই মতো। ওয়াটসন অবশ্য ডাক্তার মানুষ, অজিতও তেমনি লেখক মানুষ, তাদের নিজস্ব পৃথক অস্তিত্ব আছে। কিন্তু তোপ্‌সের বেলায় সে যা, সে তাই-ই। অর্থাৎ সত্যিই সে বালক। সব ঘটনাগুলো দেখা হচ্ছে একটি ছোট ছেলের চোখ দিয়ে। যে চোখ তোমাদের-ও। শুরুতে ফেলুদার বয়স ছিল সাতাশ, তোপ্‌সের তখন চোদ্দ। তারপর দশ বছর কেটেছে। "জয় বাবা ফেলুনাথ"-এর তোপ্‌সে দাড়ি কামায়। আর দারুণ জবরদস্ত জটায়ুটি জুটে গেছেন ইতিমধ্যে। এখন এই দলটা ইউনিক। এদের আর পায় কে? এমন তেরে-কেটে-তাক লাগানো তে-এঁটে দল তিনভুবনে কেউ দেখেনি। আগের কালের ডিটেকটিভ জুটিরা সবাই ছিল যৌবনের সীমানায় বাঁধা। বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক, ব্যোমকেশ-অজিত সকলেই। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি আশ্চর্য একটা নতুন কম্বিনেশন। অনেক বেশী সর্বব্যাপী টীম এটা। বালক,

যুবক, প্রৌঢ়—তিন বয়সের, তিনরকম চরিত্রের, তিন জীবিকার তিনজন। মানুষের জীবনের প্রায় সবখানি সময় জুড়েই দলটা আছে। আর যিনি রহস্য কাহিনীর লেখক, সেই জটায়ু কিন্তু এ গল্পের লেখক নন। তাঁর গল্পগুলো অন্যরকমের হয়, সে ডিটেক্‌টিভের কাণ্ডই আলাদা। সত্যজিৎ বাবু নিজেই একজন রহস্য কাহিনীকার ("গ্যাংটকে গণ্ডগোল" কিম্বা "বোম্বাইয়ের বোম্বেটে" "ভ্যাঙ্কুভারের ভ্যাম্পায়ারের" চেয়ে কম কিসে শুনি ?) কাজেই জটায়ুর মধ্যে যে তিনি নিজেকেই খানিক ঠাট্টা করে নিয়েছেন, এটা বললে একটুও ভুল বলা হয় না। বয়সটাও কাছাকাছি—নাই থাকলো জটায়ুর টাক তাঁর মাথায়। হলেনই বা জটায়ুর চেয়ে দু মাথা লম্বা। আসলে তিনটি চরিত্রের মধ্যেই একটু একটু করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন লেখক নিজে। তোপ্‌সের মধ্যে তো বটেই—যেহেতু তোপ্‌সেই ওঁর হয়ে বইগুলো লেখে। তার চোখটাই ধার নিয়ে তবে না লেখকের চোখ তৈরি হয়। আর ফেলুদার মধ্যে তো তিনি আছেনই। (ফেলুদাও যে ভাল ছবি আঁকতে পারে, সেটা হয়তো তোমাদের অনেক সময়ে খেয়াল থাকে না ?) আর তাছাড়া ফেলুদার যে বিপুল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার দেখতে পাও (কী না জানে লোকটা এই সাতাশ বছর বয়সেই ?) সেটাকে তো অনবরত পড়াশুনো করে খেটেখুটে ঝালিয়ে রাখতে হয় এই সত্যজিৎ বাবুকেই ? কম খাটুনি ? কোথায় ভূতত্ত্ব, কোথায় নৃতত্ত্ব, কোথায় ফিলাটেলি, কোথায় বার্ডওয়াচিং, কোথায় জিম করবেট, কোথায় গিবনের ডিক্লাইন এণ্ড ফল, এদিকে ইতিহাস, ওদিকে ভূগোল, এখানে অ্যান্টিক চর্চা, ওখানে গানবাজনা—কিছুই বাদ নেই। ফেলুদা সব রাগ-রাগিণীর নাম জানে। এমনকি "খট্" বলে যে একটা রাগ আছে, সেটা কখন গায়, তাও জানে। গুনগুন করে

গানও গায় ফেলুদা—এমন কি ওয়াজেদ আলি শাহের গজল পর্যন্ত। —"যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী, তব হাল আদমপর কেয়া গুজরী।" এই গান তো ফেলুদাই কত আগে গেয়েছিল, মনে পড়ছে? সেই 'বাদশাহী আংটি'তে। ১৩৮৫তে যে গান ছবির পর্দায় এসে উঠেছে, ফেলুদার মুখে ১৩৭৬-এই সেই গান শুনে ফেলেছি আমরা, জেনে গেছি ওয়াজেদ আলি শাহ মানুষটার প্রতি সত্যজিৎবাবুর ভালবাসার গোপন কথাটুকুও। তাই 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' দেখতে গিয়ে ওঁর সেই পুরোনো নরম ভালবাসাটাকে এক মিনিটেই চিনতে পারি। আমরা তো জানি ওটা প্রেমচন্দের ব্যাপার নয়, ওটা পুরোপুরি মানিকচন্দের নিজস্ব প্রেম। আমরা, যারা ফেলুদা পড়েছি, তারা মোটেই অবাক হই না। আর ঐ যে ফেলুদা—যে একশো রকমের ইনডোর গেম জানে, সেও তো সমস্ত পাওয়া যাবে সত্যজিৎ বাবুর বৈঠকখানা খুঁজলেই। ইনডোর গেম্‌স্ জমানোর রাজা তিনি। "খিলাড়ী" না হলে অত হেঁয়ালি তৈরি করা যায়? ও ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ বোধ হয় ছবি তৈরি করার চেয়েও বেশী। হেঁয়ালি তৈরি করা আর রহস্য কাহিনীর জালবিস্তার তো একই ব্যাপার। ক্ষেত্রটা আলাদা। একটা শব্দ সাজানো, আরেকটা হচ্ছে ঘটনা সাজানো। বুদ্ধির খেলায় অতটা উৎসাহী না হলে কেউ কখনো অমন সুন্দর রহস্য কাহিনী ফাঁদতে পারে? না রহস্য উন্মোচন করতে পারে? অর্থাৎ যাঁহা ফেলুদা তাঁহা মানিকদা! (খানিক খানিক!)

কাগজ পেনসিল নিয়ে অঙ্ক কষলে তোপ্‌সের এখন চব্বিশ, ফেলুদার সাঁইত্রিশ, আর জটায়ুর হবার কথা (১৩৮২তে রয়েল বেঙ্গল রহস্যের সময়ে ছিল ৪০)। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। তোপ্‌সে টেনেটুনে বছর উনিশেক হয়েছে। ফেলুদার বড়জোর ত্রিশ—ত্রিশের

বেশি কিছুতেই নয়। সে চিরযৌবনের দূত। আর জটায়ুর তো অনন্ত মধ্য বয়স। এই বালক সহচর আর প্রৌঢ় সঙ্গীটির দৌলতে "ফেলুদা এণ্ড কোং"-এর এখন রহস্য জগতে পূর্বসূরীহীন, একচ্ছত্র সম্রাজ্য। বাংলা সাহিত্যে রহস্য কাহিনীতে বালক সহচর আরেকজনও দেখা দিয়েছে বটে—সন্তু, কিন্তু তার কাকাবাবু ঠিক তোপ্‌সের ফেলুদার মত নন। তিনিও খুব জ্ঞানী, আর অসম সাহসী বটে, কিন্তু তাঁর বয়স অনেক, আর এক পা খোঁড়া। সন্তু তাই তোপ্‌সের চেয়ে কিছুটা বেশি জরুরি সহকারী কাকাবাবুর পক্ষে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, তাঁদের কোনো জটায়ু নেই। "জটায়ু" বাংলা রহস্য জগতে বিশুদ্ধ নবাগত, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁর কুত্রাপি কোনো পূর্বসূরী নেই। তবু বরং বিলেতে তাঁর এক মেয়ে-সংস্করণ আছেন, মিসেস অলিভার—যিনি আপন মনে আপেল খেতে খেতে রহস্য কাহিনী ফাঁদেন। তাঁর লেখা কাহিনীগুলো হয়তো অনেকটা জটায়ুর লেখা কাহিনীর মতোই—কিন্তু তিনি নিজে জটায়ুর মতো নন একটুও। যদিও সেখানেও লেখিকা নিজেকেই একটু ঠাট্টা করেছেন—এ্যারিয়্যাড্‌নি অলিভারের মধ্যেও আগাথা ক্রিষ্টির হালকা হাসি ভরা চেহারা আছে। কিন্তু জটায়ু খাঁটি বাঙালীই। ভাতে-মাছে মানুষ, একটু ভীতু, একটু সরল, একটু লোভী, আর বড্ড ভালো মানুষ। ফেলুদা সকলেরই যৌবনের আদর্শ—তার মত এমন আধুনিক, সর্ববিদ্যাবিশারদ নায়ক বাংলায় কিন্তু আগে কেউ ছিল না। একসঙ্গে এতগুলো গুণ ছিল না কারুর। শরীরে, মনে, রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে, বিদ্যেতে, সংস্কৃতিতে, সব দিক দিয়েই ফেলুদা অলরাউনডার। আদর্শ যুবক। আর সবচেয়ে বড় কথা ফেলুদার গল্পগুলো এমন সহজ আর ঘরোয়া যে, পড়তে পড়তে একটুও অবিশ্বাস হয় না। মনে হয়, এরকম তো হতেই পারে।

'জটায়ু'র লেখা রহস্য কাহিনীগুলো যদিও আমাদের পড়ার সৌভাগ্য হয় না, কিন্তু সে ধরনের অন্যান্য রচনা আমরা অনেক পড়েছি বোধহয় —যেগুলো গর্‌গরে রহস্যে-রোমাঞ্চে গায়ে শিউরে কাঁটা দেয়— সেগুলো আমাদের জীবনের থেকে আলাদা। ফেলুদার গল্পগুলো বড্ড স্বাভাবিক—আর তার কারণ তার দু'বগলে যে দু'জন অতি সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ—তোপ্‌সে আর লালমোহন গাঙ্গুলী! যাদের সবাই চেনে, এই দুজনের মধ্যে স্যাণ্ডুইচ হয়ে থাকে বলে এত অবিশ্বাস্য রকমের সর্বগুণসম্পন্ন "হিরোয়িক হিরো" হয়েও ফেলুদা আরো আশ্চর্যভাবে বিশ্বাসযোগ্য। ওদের বাদ দিয়ে ফেলুদা কিন্তু ফেলুদাই থাকবে না। ফেলুদা হওয়া আমাদের সাধ হলেও, সাধ্যের বাইরে— (যেমন ফেলুদার বাবা অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় হওয়াটাও আজ অনেকেরই সাধ, বড়জোর সাধনা অবধি হতে পারে, কিন্তু সাধ্য নয়।)

কিন্তু তোপ্‌সে হওয়া সব বাচ্চারই সাধ্যের মধ্যে—আর মনে মনে খানিকটা জটায়ু তো সব বড়-মানুষই। একটু ভীতু, একটু টেকো, মোটামুটি হার্মলেস—আমরা বড়রা প্রত্যেকেই ভেতরে ভেতরে কিন্তু অনেকটা ঐরকম দেখতে। সেই মুখটা বাইরে দেখা যায় না। কিন্তু জটায়ুর মধ্যে ঠিক নিজেদের চিনতে পারি আমরা। জটায়ু-তোপ্‌সেকে বাদ দিলে ফেলুদাকে আজ চেনা যাবে না, যেমন দাড়ি গোঁফ বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথকে, বা দশটা হাত বাদ দিলে মা দুর্গাকে। এই বেলা বলে রাখি, জীবনে তোপ্‌সের একটা অলঙ্ঘ্য ফাঁড়া আছে: তাকে একদিন না একদিন যুবক হয়ে উঠতেই হবে। আর অমনি তার ছোটদের চোখ বদলে বড়দের চোখ হয়ে যাবে, তখন সে কুমার, মানিক, অজিতের দলে মিশে যেতে বাধ্য হবে। ফেলুদার পাশে ছাড়া তোপ্‌সের অস্তিত্ব নেই, যেমন নেই বিমল ছাড়া কুমারের, বা জয়ন্ত

ছাড়া মানিকের। কিন্তু জটায়ুকে কোনদিন বদলাতে হবে না। তাঁর টাক বাড়বে, ভুঁড়ি বাড়বে, সাহসও বাড়বে—কিন্তু জটায়ুদের সংখ্যা বাড়বে না। জটায়ু জগতে একজনই মাত্র। প্রদোষ মিত্তির যেমন পঞ্চান্নতেও তরতরে যুবক থাকবে—ঠিক সাতাশে যেমন, তেমনিই, জটায়ুও সত্তরেও ঠিক এমনটিই চুলবুলে থাকবেন—তোমরা দেখে নিও আমার ভবিষ্যদ্বাণী।

পুনশ্চ—যে সূত্রটা দিয়েছিলুম টুম্পাকে সেটা এইবারে দিচ্ছি। ছাখো তোমরা ধরতে পারো কিনা—

খামখেয়ালীর রাম হেঁয়ালির সূত্র যদি চাও
ধর্মযাজক রাস্তা ধরে এক-একদিকে যাও
পাবে সাপের মাথায়।
সূক্ষ্ম সাল শস্য করো, মিথ্যে নেই ভিকট্রি ধরো
এই আমাদের রায়।

[টুম্পার সমাধানটাও দিয়ে দিচ্ছি—মিলিয়ে নিও।

ধর্মযাজক রাস্তা = বিশপ (লেফ্রয়) রোড
এক-একদিকে = একের এক নম্বর বাড়ির দিকে
পাবে সাপের মাথায় = কী থাকে ? মানিক।
সূক্ষ্ম-সাল-শস্য = (ফেলুদাই শিখিয়েছে অনু-সন-ধান)
মিথ্যে নেই = সত্য
ভিকট্রি = জিৎ
এই আমাদের—রায়।]

কেমন ? সব মিলে গেল তো ? চল তবে এবার ঐ সূত্র ধরে বেরিয়ে পড়ি—চাই কি ফেলুদার সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে। বলা তো যায় না ?

و

আজি দখিন দুয়ার খোলা

'কলকাতায় আর সুখ নেই। বাঙালির বাঙালিয়ানা গোল্লায় গেছে।'

'কেন মশাই, কী হল?

'একেই তো এই দুঃখুকষ্টের দিনকাল। তারই মধ্যে পথেঘাটে মেয়েদের দেখে যে দু দণ্ডের শান্তি পাব, তারও যো নেই। সিঁদুর-ফিদুর উঠে গেছে, সব কপালেই মাদ্রাজী কুমকুম। কে যে ইন্, কে যে আউট, কিছু টের পাই না।'

'আর মশাই ইন্-আউট! বাঙালি-অবাঙালিটা কি টের পান? সেও তো ফাইনার ডিটেলস। বলি, ছেলে না মেয়ে সেটা ঠাহর করতে পারেন? সিঁদুর নিয়ে হেদোচ্ছেন! আজকাল ফুলশয্যায় আর চিতার শয্যায় ছাড়া সর্বত্র অদ্বৈতবাদ। য়ুনিসেক্স। ভাই-ভাই।'

'কোথায় ভাই-ভাই। মেয়েরা ঠিকই মেয়ে-মেয়ে আছে। তবে বাঙালি-বাঙালি নেই। এই যে শেমিজ পরে আজকাল রাস্তায় বেরুচ্ছে সকলে। সেটা কি ভালো হচ্ছে?'

'শেমিজ কি মশাই! পুলিশে ধরবে অমন বললে। বলুন, ম্যাক্সি।'

'ওই তো মজা। আজ যাকে বলে ম্যাক্সি, এতদিন সেইটেই ছিল মিনিমাম। না মশাই। বেঁচে আর সুখ নেই। বাঙালির বাঙালিয়ানাই আর রইল না এ পোড়া শহরে।'

শুনতে শুনতে মনে হলো, সত্যিই তো। পুজুরীবামুনের যেমন

টিকি-পৈতে জরুরি, বাঙালির বাঙালিয়ানাও তেমনি। কাজে লাগুক না লাগুক, থাকাটাই আসল। মাথা ঠাণ্ডা করে এক সময় ভাবতেই হয়, আজকের কলকাতায় এই 'বাঙালিয়ানা'টা ঠিক কী-বস্তু? কোন্ সে মহার্ঘ সম্পদ আমাদের, যার বিনাশের আশংকায় আমরা নিত্য পীড়িত?

কলকাতা শহরের বাঙালি তো সেই কবেই বাঙালিয়ানা খোওয়ানো শুরু করেছে। এ আর নতুন কি? মাক্সি যদি অবাঙালি হয়, শেমিজটাই বা কোন্ বাঙালিয়ানা?

গোটা শব্দটাই তো ফরাসি। অর্থাৎ, জামা। অর্থাৎ বাঙালি মেয়ে জামা পরতো না। জামা পরাটাই ফরাসিয়ানা। আর জামা শব্দটাও তো বাঙালি নয়! আমাদের সম্পত্তি শুধু ওই একফালি কাপড়। তার নাম ধুতি, শাড়ি, চাদর-দোসুত, কি গামছা—যাই হোক। ওইটুকুই যা নিজস্ব। পুরুষ মানুষের বেলাতেই কি আলাদা? ওই পাঞ্জাবীটা? গেঞ্জিটা? পাজামা? মায় আণ্ডারওয়্যারটা পর্যন্ত ধার-করা। কলকাতা শহরের বাঙালিয়ানার জাত ঠিক করা কি সোজা?

বাঙালিয়ানা মানে বাঙালির দেশাচার। যস্মিন্ দেশে যদাচার —কলকাতায় যা পাবেন, তার নাম পশ্চিম বাঙালিয়ানা। আমরা কলকাতার লোকেরা ঠিক বাঙালি তো নই, প্রায় গোড়া থেকেই পশ্চিম-বাঙালি। তার পত্তন তো আজ হয়নি, সেই মেকলে সাহেবের যুগ থেকেই এটা হয়ে চলেছে। তাই না এককালে আমরা গোটা ভারতবর্ষের জরুরি ভাবনাচিন্তাগুলো একদিন আগেই অগ্রিম ভেবে ফেলতে পারতুম? যেহেতু ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির চরণামৃত আগে-ভাগে আমরাই খেয়েছি। বিদ্যেবুদ্ধির আধুনিকতার ওপরেই তো

চিন্তার প্রগতি নির্ভর করে। যখন থেকে সারা ভারতবর্ষ ইংরিজি শিক্ষার সুধাস্বাদন করেছে, তখন থেকেই আমাদের সুখের দিন যেতে বসেছে। এ নিয়ে আর দুঃখু করে কী হবে। বাঙালিয়ানার দিন বহুদিনই বিগত।

—দূর মশাই, তা কেন? বাঙালিয়ানা হল বাঙালির সহজ আচার-আচরণ, লোক-লৌকিকতা। এই ধরুন যেমন খাওয়াদাওয়া (ঈশ্বর গুপ্ত যেমনটি তালিকা দিয়ে গেছেন পৌষপার্বণ বর্ণনায়, কেবলই দাল-ঝোল চচ্চড়ি পিঠেপুলি পায়েস!), তারপর পোশাক-আশাক (ধুতিচাদর), পুজোআচ্চা (কালী, লক্ষ্মী), বারব্রত, বিয়ে-থা, অতিথিসৎকার, শবসৎকার, এই সব রীতিনীতি আর কি। আজকাল সমাজতত্ত্বে, নৃতত্ত্বে যা নিয়ে এত গূঢ় কীর্তি সৃষ্টি হচ্ছে!

—ওরে বাবা বাঙালিয়ানা এমন ঘোর বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক ব্যাপার? তা আমরা তো সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এ সব জানি না মশাই, আমরা কী করেই-বা বুঝব বাঙালিয়ানা ঘুচছে কি ঘুচছে না?

—আহা দেশীয় প্রথাগুলো যে উল্টে পাল্টে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে মুছে যাচ্ছে এটা তো আমরাও বুঝতে পারি, কবেই তো—'আমরা হ্যাট কোট আর নেকটাই পরে সেজেছি বিলাতী বাঁদর'—আর এখন সায়েব তাড়িয়ে বিলিতি বাঁদরামিটা নিজেদের মধ্যেই কায়েমী করে নিচ্ছি। গলিতে—গ্যারাজে 'জিংগ্‌ল-বেল্' আর 'টুইগল-টেল্' শেয়াল-পণ্ডিতের ইস্কুলগুলো মেকলে সায়েবের আত্মার অপার তৃপ্তি বিধান করছে। এই রকমই তো কথা ছিল? শহুরে বাঙালির বাঙালিয়ানার গোটা ইমারতটাই অবাঙালিয়ানার চুনসুরকি সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা। গোপালভাঁড় যদি কোনও বাঙালি বহুভাষাবিদের পরিচয় বের করতে ওই অন্ধকার সিঁড়িতে ধাক্কা মারার টেকনিকটা ব্যবহার করতেন তিনি

কিন্তু ঠকে যেতেন। আমরা গাল দেবার সময়ে সযত্নে মাতৃভাষাটাকে বাঁচিয়ে চলি। ও কম্মোটি সারতে রাজভাষা কিংবা রাষ্ট্রভাষাই ভাল। কিন্তু প্রেম করতে হলে চাই বাংলাভাষা। গোপালভাঁড় প্রেমের টেকনিক ব্যবহার করলে তবেই বাঙালির বাঙালিয়ানা টের পেতেন। সে-বাঙালিয়ানা কোনোকালে ঘুচবে না মুছবে না উল্টোবে না পাল্টাবে না। হতে পারে আজ স্ত্রীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটি নিতে নিতে মিষ্টি করে হাসতে গিয়ে হঠাৎ থমকে থেমে ভয়ে 'থ্যাংকইয়ু' বলে ফেলতে হবে কর্তাকে, নইলে আবার ছেলের ইস্কুলে আন্টি বকবেন। বাড়িতে প্রাকটিস না করলে হয়? ইস্কুল আর কত শেখাবে! এবং তাই ঠাকুমাও গঙ্গারঘাটে পাঠ শুনতে যাবার আগে ঘুমন্ত নাতিটাকে হাতছানি দিয়ে 'দাদাভাই, টাটা' বলে নিত্যকর্মটি সেরে নিতে ভুল করেন না। ইংরিজি ইস্কুলের দাপটে কলকাতার ছা-পোষা বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার এখন থরহরি কম্পিত। এতে দেশের নিরক্ষরতা দূর হোক না হোক, সাক্ষর সাবালকদের সহজ কাণ্ডজ্ঞান যে বিদূরিত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালিয়ানা? সেটা কি দূর হওয়া এতই সহজ?

ধুতি শার্ট পাম্পশু-পরা যে বাঙালিবাবু রোজ পানটি মুখে দিয়ে আপিসে যান, দোকানে বসেন, তিনিও যে ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট সাহেবি পোশাক পরে আছেন তা কি আমরা খেয়াল করি? আর মেয়েদের তো শাড়িটি ছাড়া আপাদমস্তকই সাহেবি, ব্লাউজ পেটিকোট থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ পর্যন্ত। সাহেবিয়ানা শহুরে বাঙালিয়ানার অঙ্গ। আপিস ইস্কুলে, ট্রামে-বাসে, পকেটের পার্সে, সিনেমা-থিয়েটারে, র‍্যাশন কার্ডে টেবিলে-চেয়ারে কোথায় নেই? বাঙালির যা সবচেয়ে আপন, বিশ্বসংসারে আমাদের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে যাকে মনে করি,

সেই 'আড্ডা'ই কি জমতে চায় ডবল ডিমের মামলেট আর হাফ-কাপ চা নাহলে? নিদেনপক্ষে ক'টা সিগারেট?

অর্থাৎ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আধুনিকতা আর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব প্রায় সমার্থক। প্রগতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিবর্তনগুলি আনতে হচ্ছে যত, গ্রামীণ বাঙালির ঐতিহ্য তত বাদ পড়ে যাচ্ছে। মুছে যাচ্ছে বারো মাসের তের পার্বণ। এখন রেজেস্ট্রি-বিয়ে থেকে ইলেকট্রিক-চুল্লি পর্যন্ত শহুরে বাঙালির জীবনটাই দো-আঁশলা। এটাকে বাঙালিয়ানার অধোগতি বলে না-ভেবে জীবন-ধারার প্রগতি বলে ভাবতে শিখতে হবে। বেছে নিতে হবে জরুরি দুধটুকু, ঢেলে ফেলতে হবে উপরি জলের অংশটা। আরও একটু ভাবতে হবে নিজেদের নিয়ে। খাঁটি বাঙালিয়ানা যদি নির্ভেজাল প্রাচীনপন্থা হয়, তাহলে সে-বস্তু এখন কোথাও অবশিষ্ট নেই। রেলহীন, বিদ্যুৎহীন অজ পাড়াগাঁয়েও নেই। সেখানে পিঁড়ির পাশে এসেছে টুল, টেবিল, প্রদীপের পাশে হ্যারিকেন লণ্ঠন, টর্চ, ভাতের হাঁড়ির পাশে জলের কেটলি, পেতলের গাড়ুর বদলে প্লাস্টিকের মগ। এবং যাত্রার চেয়ে বেশি পছন্দ দশ মাইল দূরের হিন্দি সিনেমা। দুনিয়া বদল রহী হ্যায়, আঁসু বহানেওয়ালে!

কলকাতা শহরের বাঙালির মহার্ঘ বাঙালিয়ানা, যা নাকি গেল-গেল, তা ঠিক কাকে যে বলে, এটা আর খুব স্পষ্ট নেই এই জগা-খিচুড়ি শহরে।

মধ্য কলকাতার কুবের-আলয় ছাড়ি উত্তরে এবং দক্ষিণে বাঙালির বাস। উত্তরে এখনও তবু যতটা বাঙালিয়ানা বাকি আছে, দক্ষিণে তার চেয়ে অনেক কম। অন্তত অশনে-বসনে তো বটেই। ভজনে-পূজনেও। সেদিন একটা বাসে আমি সিঁথির কাছ থেকে গোলপার্কে

এলুম, যে বাসটায় চড়লুম—অর্থাৎ বাসটাকে যে সংস্কৃতির, যে জগতের মানুষরা ভরে রেখেছিলেন—সে বাসটা থেকে কিন্তু নামলুম না। গোলপার্কে অন্য এক সংস্কৃতির, অন্য এক কালাশ্রয়ী জনতার ভিড় ঠেলে নেমে এসেছিলুম। অথচ পথের দু পাশে ছিল একই চিত্রিতার হাস্যবদন, একই বিজ্ঞপ্তির নিরোধ-রোদন। বাসের ভেতরেও ছিল একই খেলার স্কোর গণনা। তবু তারই মধ্যে বদলেছে মুখের ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, সাজ-পোশাক, হাব-ভাব। বাঙালিয়ানায় স্পষ্ট রুচি-বিবর্তন ঘটে গিয়েছে উত্তরের শহর আর দক্ষিণের শহরের পথিমধ্যে।

উত্তরে আছে পুরোনো কলকাতা, দক্ষিণে নতুন। এখানেই গড়ে উঠছে নতুন বাঙালিয়ানা। উত্তরের অভিজাত বাঙালিয়ানা, আর দক্ষিণের আদেখলে বাঙালেপনা—আগেকার এই সরল বিভাগটি এখন আর চলে না। শুধু যে অর্থনৈতিক চেহারাটায় অদলবদল হয়েছে তা নয়, দক্ষিণে এখন একটা আলাদা সংস্কৃতি হয়েছে। সেটাই চলতি, সেটাই সম্মুখবর্তী। বাঙালির আভিজাত্য আর উত্তরবর্ত্মে নেই, ফ্লোর ক্রসিং করে কখন দক্ষিণে সরে এসেছে (তাই না বাড়ির ভাড়া এখানেই ঊর্ধ্বমুখী!)। আলোবাতাস সবই যে দক্ষিণে। শুধুই নৈসর্গিক আলো হাওয়া নয়, মনের আধুনিকতাতেও শোনা যায় নাকি দক্ষিণেই মুক্তির দিক। অথচ আমার ছোট বেলাতেও অর্থাৎ দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং তারপরেও বিয়ের বাজার করতে কলকাতাতে যাওয়া হতো। কালাচাঁদ মিস্ত্রীর জুতো, ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের মুর্শিদাবাদী, বেনারসী কুঠির বেনারসী। আর এখন? ও-পাড়ার মানুষরাই ভিড় জমান গড়িয়াহাটে পুজোর বাজার করতে। রেস্ত-ওলারা আসেন ঝলমলে অবাঙালি দোকানের ভ্যারাইটি দেখে আধুনিক কেতার কাপড় কিনতে। রেস্ত যাঁদের কম তাঁরাও আসেন হকার্স কর্নার থেকে কম

দামে হালফ্যাশানের রেডিমেড পোশাক কিনতে। আগে উত্তরকেই বলা হতো 'কলকাতা' দক্ষিণকে ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, কালীঘাট। সেদিন আমার মা যেই বলেছেন—'একবার আমাদের কলকাতার বাড়িতে'···অমনি আমার মেয়ে ফোঁস করে উঠেছে—'তার মানে? এটা বুঝি কলকাতার বাড়ি নয়?' আমরা বালিগঞ্জের বাসিন্দা। কি করে তাকে বোঝাই, না, এটা সে কলকাতা নয়। এর নাম দক্ষিণ-কলকাতা। এখানে চল্লিশ ফুট চওড়া রাস্তাকেও 'গলি' বলা হয়। এখানে প্রায়ই রাস্তার দু ধারে গাছের ছায়া থাকে। দুটো বাড়ির মধ্যে নিদেনপক্ষে দশ ফুট, সাধারণত কুড়ি ফুট ফারাক থাকে। এখানকার বাসিন্দারা বসত বাড়ি করার আগেই বেড়াবার গাড়ি কেনে। উনুনে হাঁড়ি না চড়ুক, গিন্নির অঙ্গে দামী শাড়ি চড়ে। এ কলকাতা সে কলকাতা নয়। এখানে পাড়ায় পাড়ায় যুবতী মেয়েরা নাচের ইস্কুলে নাচ শেখে। বাড়ির গিন্নিরা বাজারে গিয়ে মাংস কেনেন। এখানে দুর্গাপুজো কমিটিতে মাদ্রাজী নামের ছড়াছড়ি। এ আরেক শহর।

আরে, এটা কি কলকাতা? দূর!

এখানে কি থিয়েটার পাড়া আছে? এখানে বইপাড়া আছে? এখানে ভাল সন্দেশের পাক-জানা ময়রা কেউ আছে? ভাল তেলে-ভাজার দোকান পর্যন্ত নেই একটা। এখানে বড়বাজার নেই। স্টক এক্সচেঞ্জ নেই। কলকাতার ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড যদি মধ্য কলকাতায় থাকে তবে কলকাতার নাভিকুণ্ড ও যকৃৎ আছে উত্তরে, আর নাসা কর্ণ দক্ষিণে। দক্ষিণে অবশ্য থিয়েটারের অভাব এখন তেমন নেই, হয়েছে দু-একটা মঞ্চ। আর আছে অজস্র বিচিত্রানুষ্ঠান। কিন্তু বই? বই দেখতে বই ঘাটতে বই নাড়তে হলে উত্তরে যেতেই হবে। বইয়ের

অভাবটা এ-পাড়ায় প্রচণ্ড। দক্ষিণের উঠতি কালচারে বোধ হয় পরনটাই মুখ, পড়নটা একেবারে গৌণ। নইলে বইপাড়া গড়ে উঠল না কেন? পোশাক পাড়াটি তো দিব্যি জমজমাট হল! এ-পাড়াতেও কলেজের ছড়াছড়ি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রয়েছে। তবুও দক্ষিণে কোনও কলেজ স্ট্রীট জন্মাল না, সে কি রুচির অভাবেই নয়?

কলকাতার বাঙালিয়ানা মানেই দো-আঁশলা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি, তা উত্তরেই হোক বা দক্ষিণেই হোক। কিন্তু দক্ষিণে ইদানীং আমরা শুধুমাত্র দো-আঁশলা নেই, একটা বেশ গুরুপাক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে এদিকে। দক্ষিণে মারোয়াড়ি, গুজরাতি, মারাঠী বাসিন্দা যথেষ্ট। কিন্তু বাঙালির সঙ্গে মৌল জাতিভেদ থাকার জন্যই কিনা জানি না, আমরা তাঁদের সকলের দিকে তেমন করে বিনিময়ের হাত বাড়াইনি, যেমন বাড়িয়েছি দাক্ষিণাত্যের দিকে।

কলকাতায় দক্ষিণী মানেই মাদ্রাজী। এই এক লেবেলে বিন্ধ্যের দক্ষিণের সকল মানুষই পরিচিত। কেরল, তামিলনাদ, অন্ধ্র, কর্ণাটক, কোনো ভেদ নেই আমাদের মহান চোখে (আসলে অবশ্য আরো বড় আরো উদার একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আছে। যে দলে সসাগরা পৃথিবীর যাবতীয় জাতি পড়েন, আমরা বাদে: তার নাম অবাঙালি!)। মাদ্রাজীদের আমাদের সঙ্গে মিলমিশ হবার আমি তো পাঁচটা প্রধান কারণ খুঁজে পাই। প্রথমত, তাঁরাও আমাদের মতই প্রধানত চাকুরিজীবী কেরাণী মধ্যবিত্ত। গুজরাতি মারোয়াড়ি প্রতিবেশীদের মতো ব্যবসায়ী জাতি নন। আমাদের দ্বিতীয় জরুরী মিল—হিন্দিবিরাগে। তৃতীয় কারণ—ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও তজ্জনিত অপ্রীতি ঘটেনি। চতুর্থ, তাঁরা আমাদের অতি উত্তম ভাড়াটে। পঞ্চম—দক্ষিণীরা স্বভাবত মিতভাষী,

যুক্তিচালিত, শান্তিপ্রিয়। এবং এজন্যই আমাদের অমিত বাক্‌শক্তি আবেগ-প্রাধান্য ও চাপল্যের সঙ্গে তাঁরা সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারেন, ঝগড়া বাধান না। উত্তর কলকাতায় এই মাদ্রাজী উপনিবেশ নেই। দক্ষিণীরা দক্ষিণ কলকাতাটাকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের মেস-হোটেলগুলি প্রতিষ্ঠার জায়গা হিসেবে। লেক বাজার অঞ্চল থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত দক্ষিণী সভ্যতার রাজত্ব।

বাঙালি যে বদলাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এই বোধ হয় প্রথম আমরা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অন্য একটি ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঘরে তুলছি। কলকাতা শহর ছোট ছোট প্রদেশের সমষ্টি হয়েই আছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন পাড়া, বিচিত্র জীবন। কিন্তু বদল শুরু হয়েছে, এবং সেটা আশার কথা। যেমন দেখুন, আমাদের এ-পাড়ায় বারোয়ারি দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট বাংলা-ইংরিজি দুই ভাষাতে ছাপা হচ্ছে গত দশ বছর ধরে। কেন? মহানবমীতে যে প্যাণ্ডেলে নবরাত্রি সমাপ্তির 'ললিতা সহস্রনামন' পুজো হয়। সেদিন বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিলোন দক্ষিণী প্রতিবেশীরা। কী চমৎকার তার স্বাদ!

দক্ষিণ কলকাতায় মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়িতে অতিথি এলে—'চা, না কফি?' বলাটা বেশ চালু হয়েছে। আগে এটা প্রচলিত ছিল শুধু ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজেই। উত্তরের দিকে এখনও ঠিক ততটা চালু হয়নি। দক্ষিণে যে-বাড়িতে কফি হয় না, সেটা হয় না রুচির অভাবে তত নয়, যতটা অর্থের অভাবে। কফির খরচ বেশি। কফিতে বাঙালি জিভ এখন খুব অভ্যস্ত শুধু কফি হাউসের কল্যাণেই নয়। আগে মাদ্রাজী রেস্তরাঁগুলিতে ইতস্তত দু চারজন পররুচি খানার বাঙালিকে দেখা যেত। আর এখন সেখানে দু চারজন নিরুপায় মাদ্রাজীকেই ইতস্তত দেখা যায়। ঘরজোড়া বাঙালি ছেলেমেয়েদের ভিড়ে কুণ্ঠিতভাবে বসে

তাড়াতাড়ি ছুটি খেয়ে নিচ্ছেন। শুধু কি দোকানে? এখন বাঙালি রান্নাঘরেও কালো-জিরে-কাঁচা-লঙ্কার পাশে ঠাঁই পেয়েছে অব্যর্থ কারি-পাতা সর্ষে-ফোড়ন শুকনো-লঙ্কা। বাংলা মুগের ডালের পাশে দক্ষিণী সম্বর ডাল। উত্তর কলকাতাতে এখনও হয়তো অতিথি এলে কি ছেলেপুলেরা ইস্কুল থেকে ফিরলে শালপাতার চাঙাড়ি ভরে সিঙাড়া-কচুরি আসে। এ পাড়ায় কিন্তু বাজিমাৎ করেছে শীতল সবুজ কলাপাতায় মোড়া উষ্ণ কোমল দোসা। নাতি এলে এ-পাড়ার দিদিমা বলেন—'ওরে একটা মশলা দোসা খেয়ে যাবি না?' দাম কম, একবার খেলেই বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত।

এ তো গেল খাদ্য এবং পানীয়। এবার পরা। মেয়েরা অনেকদিনই দক্ষিণী শাড়ির ভক্ত। এখন বাঙালি বিয়েতে বেনারসীর একচেটিয়া আধিপত্য একটু টলে উঠেছে কাঞ্জিভরমের জনপ্রিয়তায়। ধনেখালি আর টাঙাইলের পাশে প্রায় উঠে এসেছে দক্ষিণী তাঁতের সুতী শাড়ি। আর গয়নার? বাঙালি মেয়ের গলায় কালোপুঁতির মঙ্গলসূত্রম্ তো কয়েক বছর ধরেই চালু ফ্যাশন। অল্প সোনায় দিব্যি সোনার হার। শুধু সোনা? ফুলের সাজ? এ-পাড়ায় এখন মোড়ে মোড়ে ফুল নিয়ে বসেন মালাকারের দল। দক্ষিণী মেয়ের দেখাদেখি বাঙালি মেয়েরও খোঁপায় ফুলের মালা চড়েছে। এটা কিন্তু বাঙালির গ্রামীণ ঐতিহ্য নয়, শহুরে গৃহস্থবাড়ির সান্ধ্য আচারও নয়। আমরা সিঁদুরের বদলে কপাল সাজাই রংবেরঙের ঝুরো কুমকুমে। আমরা মেয়েরা যেভাবে দক্ষিণকে সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছি, বাঙালি পুরুষ কিন্তু তা পারেননি। কেবল কাঁধে চাপিয়েছেন চওড়াপাড়ের পাটকরা চাদর শান্তিনিকেতন মারফৎ (ধুতি ভাঁজ করে লুঙ্গির মত হাফ ধুতি পরবার দক্ষিণী কায়দাটা বাঙালি পুরুষ কেন রপ্ত করেননি জানি না, অথচ যুদ্ধের

পর গোরা সৈন্যের কাছ থেকে হাফপ্যাণ্টটি কুড়িয়ে নিয়েছিলেন!)। কেবল রান্নাঘরে আর আলনাতেই নয়, ঠাকুর ঘরেও দক্ষিণপন্থী বিপ্লব! দক্ষিণের ঠাকুর দেবতারা প্রবেশ পেয়েছেন শহুরে বাঙালির হৃদয়ে, বিশ্বাসের গুপ্তকক্ষে। আগে ছোট মেয়েদেরও গলায় যখন সরু সোনার হার থাকত সেই যুগে, সেই হারের লকেটে থাকত মিনে-করা বাঙালি দেবদেবীর ছবি। পুরুষ মানুষের অঙ্গে এ বস্তু কখনও দেখিনি। আজকাল য়ুনিসেক্স রক্ষাকবচ বেরিয়েছে, রঙিন প্লাস্টিকের আংটি—ছিনতাই হবে না, স্ত্রীপুরুষের প্রবলেম নেই। এবং সেই আংটিতে আছেন শ্রীথিরুপতিনাথ। অথবা আছেন দক্ষিণ-উত্তরের সেই অসামান্য সেতুবন্ধ, সবার উপরে সাঁইবাবা সত্য। এই আংটি-কবচের ঐতিহ্যটা পুরোপুরি দক্ষিণী তীর্থ থেকে পাওয়া। আগে পাঞ্জাবীদের বাসে দেখতুম, গুরু নানকের পাশে গান্ধী, নেহরু। বাঙালির বাসে বা ট্যাক্সিতে ছিলেন মা কালী, শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন সেই জবাফুলের মালাটিকেই দুলতে দেখি থিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বরের গলায়। শুধু কি তাই? মানত-এ পর্যন্ত 'থান'-বদল হচ্ছে। তারকেশ্বর-কালীঘাট এ সব এখন আউট—সেখানেও ভেঙ্কটশ্বরের জয়-জয়কার। যাঁর মন্দিরের দৈনিক আয় কম করেও কয়েক লাখ। তিনিই যে জগতের সবচেয়ে জাগ্রত দেবতা তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? মানত করতে হলে সেখানেই করবো, এ তো সোজা হিসেব!

এইভাবে ক্রমশ দক্ষিণের বাঙালি আরও দক্ষিণে হেলে পড়ছি। আগে কেবল শান্তিনিকেতনী নাচগানের স্কুল ছিল পাড়ায় পাড়ায়, এখন সর্বত্র দক্ষিণী ধ্রুপদী নৃত্য শেখার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরে ঘরে কথাকলি, ভারতনাট্যম্ শিখছে আমাদের বাঙালিনী কন্যারা। দক্ষিণী

সঙ্গীত শিক্ষা এখনও কলকাতায় চালু হয়নি, তবে বীণাটা সদ্য শুরু হয়েছে। আর সত্যজিতের কল্যাণে গুপী গাইনের গানবাজনায় কর্ণাটক সঙ্গীতের সুর এখন বাঙালি শিশুর পরিচিত। কণ্ঠস্থ।

আমরা কলকাতার বাঙালিরা বড্ড অহংকারী। অবাঙালি প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের মনোভাব গত দুশো বছর ধরেই বন্ধু-বৎসল নয়, শ্রদ্ধার বালাই নেই। একমাত্র পশ্চিমের প্রতিই আমাদের যা কিছু নতির নীতি, আর-সকলকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা আমাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। তাতে ধনী-দরিদ্র তফাৎ নেই।

আচ্ছা, আমাদের এত অহংকার কেন? তার কারণ এই মোহিনী কলকাতা। এককালে যে ছিল দারিদ্র্যদুর্গতিহারিণী, সর্ব সঙ্কটনাশিনী, কর্মপ্রদায়িনী, মক্ষিরানী। একাধারে রাজধানী, শিল্পনগরী, বন্দরনগরী —দু'পাশের দরিদ্র রাজ্যগুলি থেকে কর্মপ্রার্থীদের টেনে এনেছে, অন্ন যুগিয়েছে দিনের পর দিন। আধুনিকতার সঙ্গে তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে 'বাঙালী' সংস্কৃতির মাহাত্ম্য—যেহেতু উন্নত, আধুনিক জীবনের জাদুর কাঠির স্পর্শ প্রতিবেশী রাজ্যগুলি পেয়েছে বাংলারই হাত ফের্‌তা। তাই 'বাঙালিয়ানা' আমাদের বড় গৌরবের, বড় আদরের ধন।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের মদমত্ততা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে কিছু কম নয়। সেই দম্ভেই আমরা প্রতিবেশীদের ভালবাসতে পারিনি। কি মন্দির-ভাস্কর্যে, কি মন্দির-নৃত্যে, কি রেশম তাঁতের শিল্পে, কি রূপোর ফিলিগ্রিতে, কি পটের ছবিতে, কি লোকযাত্রায় অনন্যসাধারণ সেই সব প্রতিবেশী রাজ্যের তুলনায় কী আছে আমাদের? কোন্ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য? কোন্ 'ক্লাসিক্যাল কালচার'? কালাপাহাড়কে অন্যত্র যেতে হয়েছিল হিন্দু সংস্কৃতি ধ্বংস করবার

উদ্দেশ্যে। তবে কি বাংলায় ধ্বংস করবার মতো তেমন কিছুই ছিল না? কিছু থাকলে তবে তো ধ্বংস হবে!

আমাদের আছেন কিছু মানুষ। কিছু ইতিহাসবিশ্রুত উজ্জ্বল পুরুষ। শ্রীচৈতন্য বাদে তাঁরাও প্রত্যেকে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির সন্তান: রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ। স্বীকার না করে উপায় নেই, সংকর-সভ্যতার বীজ আমাদের রক্তে। আর্য-অনার্য, পীত-কৃষ্ণ সবরকম রক্ত বইছে আমাদের ধমনীতে, সবরকম রংয়ের ছোপ আমাদের চামড়ায়, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও। কলকাতার নাগরিক সভ্যতা প্রধানত বিদেশী সংস্কৃতিরই অবদান, একথা কেউ অস্বীকার করেন না। তাহলে এত দম্ভ কিসের? না ছিল আমাদের উত্তর ভারতের দরবারী সংস্কৃতির বাদশাহী গুলবাহার, না ছিল দক্ষিণের মন্দির-সংস্কৃতির মালাচন্দন। জানি না কবে বাঙালী শিল্পী গিয়ে ওঙ্কারভাটে পাথুরে ভাস্কর্য গড়েছিলেন, কিন্তু এই নদীবহুল ভাঙ্গন-প্রধান পলিমাটির দেশে অন্তত তাঁরা কোনও স্বাক্ষর রেখে যাননি। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে আজ যা বেঁচে আছে তা শুধুই লোকসংস্কৃতি। এবং সে সংস্কৃতিও লোকসান্নিধ্যের লোভে বাঙালির ঘরসংসার পরিত্যাগ করে চালা বেঁধেছে শহরজোড়া মেলার মাঠে, ফুটপাতজোড়া কারুশিল্পের দোকানে। ডালায়-কুলোয়, কাঁথায়-পুতুলে, পটে-পোড়ামাটিতে। বড় জোর বালুচরী-বিষ্ণুপুরীতে। এবং ব্যবসার হাওয়া যেদিকে, তাতে এ-বাঙালিয়ানা ঘুচে যাবার সম্ভাবনাও অল্প। বরং রাজ্যে-রাজ্যে গজিয়ে উঠবে বাঁকুড়ার ঘোড়া, আর কালীঘাটের কাঠের পুতুল। নিশ্চয়ই এই 'বাঙালিয়ানা'র কথা আলোচনা করছি না আমরা? তবে কোন্ সে বাঙালিয়ানা যা কলকাতার নিজস্ব মহার্ঘ সম্পদ? যেদিক থেকেই ভাবি, দিশি লোক-

সংস্কৃতি আর বিদেশী ঔপনিবেশিকতার মিলনে সদ্যোজাত ককটেল-কালচারের নাম 'বাঙালিয়ানা'। সংকর-সভ্যতার আবার জাত-যাওয়া নিয়ে এত হাহাকার কেন? জাত কি আমাদের কোনোকালে ছিল? ধার-করা আধুলি আঁচলে বেঁধে আমাদের গুমোর কিসের এত?

গত ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরেই কলকাতার ওপর দিয়ে নানাধরনের বিচিত্র তাণ্ডব চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বেয়াল্লিশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পঞ্চাশের মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশবিভাগ, চীনের যুদ্ধ, পাক যুদ্ধ, বাংলাদেশ যুদ্ধ, নকশালবাড়ি আন্দোলন—একের পরে এক তরঙ্গ বিক্ষোভে বার বার টাল-মাটাল হয়েছি, নতুন করে জেগে উঠেছি, নতুন করে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। (আমরা শ্রীচৈতন্যের দেশের লোক কে বলবে, জঙ্গী মনোভাবে আমরা বাঙালিরা কারুর চেয়ে কম যাই না!) ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে এতসব ধাক্কা লাগেনি। ইতিহাস কেমন করে যেন বিন্ধ্যের ওপরের প্রাত্যহিক শান্তি এতদূর বিঘ্নিত করেনি। সেখানে অব্যাহত রয়ে গিয়েছে শাশ্বত ভারতীয় জীবনধারা, সেখানে স্পন্দিত রয়েছে স্বদেশী সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতিচ্ছন্দ। এমনও তো হতে পারে যে সেই কারণেই সচেতনভাবে না হলেও, শুরু হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার দক্ষিণায়নের পালা? আমরা বুঝে গিয়েছি 'বাঙালিয়ানা' একটা জীবন্ত বেগ, একটি চলন্ত স্রোত। তাকে দিক্ নির্দেশ দিতে হয়। পশ্চিমে তো অনেক চলেছি। এক সময়ে ক্রমশ পায়ের নিচে থেকে জমি সরতে শুরু হয়েছে। পশ্চিমের দিকে আরও চললে যে অস্তে ডুবে যাব। এবার একটু সামলে নিতে হয়। আমরা এখন গৃহাভিমুখী। ভারতের দক্ষিণে সেই ভারতীয় সভ্যতার শাশ্বত গৃহটি থেকে গেছে। আমরা যে শিকড় খুঁজছি, সেই

শিকড় পশ্চিম বাংলায় নেই। আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি কঠিন কালো দ্রাবিড়ভূমিতে হয়তো আছে সেই ধ্রুপদী আত্মশক্তি। কে জানে, আমরা নিজের অজান্তে সেই তৃষ্ণায় এত দক্ষিণাপন্ন কিনা?

উন্নত সংস্কৃতি চিরকালই দুর্বল সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি যে আমাদের গ্রাস করেছিল, তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না। ধার-করা আলোয় জ্যোতির্ময় হয়েই বাঙালিয়ানা গড়ে উঠেছিল এককালে। এখন তাতে আর আলো নেই। এখন চাই নতুন জ্যোতির উৎস। পড়তি সংস্কৃতির পুনর্বাসনের জন্য ধ্রুপদী সংস্কৃতির কোলে ফিরতে চাওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে। যেখানে নিজের অতীত ফাঁকা, সেখানে অন্যের কাছে অঞ্জলি পাততে হবে বৈকি। ইংলণ্ড-ফ্রান্সে যা ছিল না তার জন্য যেতে হয়েছিল গ্রীসে-রোমে। পশ্চিমবাংলায় যা নেই তার জন্যই কি আমরা দক্ষিণের দিকে জানলা খুলেছি?

এতে আমাদের অহং-এ ঘা লাগছে না, তার কারণ ঐতিহাসিক দূরত্ব। দক্ষিণের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের দুঃসম্পর্ক যেহেতু ছিল না, সেহেতু তার প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা নেই। নেই অপ্রীতির যোগ! দাক্ষিণাত্যের রক্ষণশীলতা ভারতীয়ত্বের শিকড় শক্ত করে ধরে রেখেছে। সেখানে না ঢুকছে নবাবিয়ানা, না সাহেবিয়ানা। আমরা কি সেই অকলঙ্ক সঞ্জীবনী বাতাসে পুনর্বাসিত হবার আশায় আজ দক্ষিণমুখী?

ভেবে দেখলে ঠিক খেয়াল হয় যে, বাঙালিয়ানা বলে আমাদের কোনও নির্দিষ্ট সম্পদ নেই। যদি সেই সম্পদ গড়ে তুলতে চাই, নতুন করে বাঁচতে হবে। বাঙালিয়ানার শিকড় ভারতীয়দের মাটিতে ভাল করে না গাঁথতে পারলে আমাদের পুনর্জীবন, পুনর্বাসন সহজ নয়।

বাঙালিয়ানা যদি হয় কলকাতার মানুষের সহজ আত্মবিশ্বাস আত্ম-পরিচিতির লক্ষণ, স্বকীয়তা, তার জন্য চাই ভারতীয়ত্বের মূল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কলকাতার বাঙালিয়ানাকে হতে হবে 'অন্ধ' প্রাদেশিকতামুক্ত, সর্বভারতীয়ত্বের গুণসম্পন্ন, মুক্ত মনের সংস্কৃতি। বাঙালিয়ানা শুরু হয়েছিল জাতিগত সংস্কারকে বর্জন করে, বিদেশী সংস্কৃতির কাছে মুক্ত অঞ্জলি পেতে সমৃদ্ধি গ্রহণ করে। সেই গ্রহণের ক্ষমতাই বাঙালিয়ানা। ক্রমশ যে বর্জনপ্রধান বাঙালিয়ানা তৈরি হয়েছে কলকাতাতে, সেই সাংস্কৃতিক অস্পৃশ্যতা-দোষমুক্ত হতে না পারলে মধ্যবিত্ত বাঙালির মনের এই অতৃপ্তির এই অপূর্ণতাবোধের সমাপ্তি হবে না। যে শ্রদ্ধার দৃষ্টি এককালে ইয়োরোপের দিকে তুলেছিলাম সেই চোখই এবারে ভারতবর্ষের দিকে তুলতে হবে। দক্ষিণ তো কেবল প্রথম ধাপ মাত্র। তাছাড়া শুধুই শাড়ি গয়না নাচ গান ভজন পূজন খাদ্য পানীয় নিয়ে থাকলেই চলবে না। নতজানু হতে হবে সাহিত্যের কাছে। যে কোনও সংস্কৃতির নিরিখ তার মূল্যবোধে। এবং সেই মূল্যবোধ-গুলি সবচেয়ে ভাল করে ফোটে সাহিত্যে। বাঙালিকে আরো ভারতীয় হয়ে উঠতে হবে, নইলে নিত্যনতুন অবস্থায় পুনর্বাসন সম্ভব নয়। নিজেকে একঘরে করে রাখাই তো ক্ষয়িষ্ণুতার সাধনা।

ভাবতে ভাবতে আঁতকে উঠলুম, তবে কি বাঙালিয়ানার গুমোরটাই এখন বাঙালিয়ানা হয়ে দাঁড়িয়েছে? যতদিন আমাদের এই গুমোর না কাটছে, প্রকৃত বাঙালিয়ানা ততদিন গড়ে উঠবে না। ইতিহাস দর্পহারী।

মনে আর মুখে

আপনি কি মনে আর মুখে এক? আপনাকে কি লোকে বলে—"ঈশ্ কি সরল? ঠিক শিশুর মতন মনটা?' বলে কি, "ওর বাপু সামনে পেছনে নেই?" সর্বনাশ—তাহলে আপনি সত্বর সাবধান হোন। মনে করুন শেষের সেদিন ভয়ংকর যখন অন্য লোকে বাক্য কবে আপনি রবেন নিরুত্তর। মনের কথাগুলো যদি বাইরে শোনা যেত তাহলে কিন্তু আচ্ছা কেলেঙ্কারি হতো; প্রথমত প্রচণ্ড শব্দ হতো জগতে, নৈঃশব্দ্য বলে কিছুই থাকত না, এবং কেউ কিছু শুনতে পেতো না। সর্বক্ষণ সকলের মনের কথায় যদি পৃথিবীর বাতাস ধ্বনিত হতো তাহলে স্যানিটি বলেও কিছু থাকতো না পৃথিবীতে, থাকতো না সমাজ সংসার ধর্ম কিংবা পলিটিক্স। তা, শব্দ বাদ দিন, ধরুন যদি নৈঃশব্দ্যই জানাজানি হয়ে যেত? সবার মনের কথা বাইরে? চোখ বুজে একটু ভেবে দেখুন তো? মনটা যদি কাচের তৈরি অ্যাকোয়ারিয়ামের মত স্ফটিকস্বচ্ছ একটা বাক্স হতো, আর তার মধ্যে লাল নীল মাছের মতো ইচ্ছে-অনিচ্ছেরা ষড়রিপুর সঙ্গে লেজ খেলিয়ে সাঁতরে বেড়াতো আর বাইরে থেকে সব স্পষ্ট দেখা যেত, যে দেখতো সেই বুঝতে পারতো আপনার মনের অবস্থা কী, মর্মের কথা কী, অন্তরের অন্তস্তলে কী ঘটছে। তাহলে কি আপনি খুশি হতেন? অন্যের মনের সংবাদও আপনার কাছে অজানা থাকতো না, সব অন্ধকার কোনাচ্গুলি আলোক-উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। "কেউ আমাকে

বোঝে না", "হায় আমি কী একা," বলে এই যে 'এলিয়েনেশনের নাকে-কান্না, এই যে 'কমিউনিকেশন গ্যাপ' নিয়ে জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য ও শিল্পকর্ম রচনা, এই সমস্ত করবার সুযোগই থাকতো না। ধরুন সবাই সবাইকে তন্ন তন্ন করে বোঝে, আঁতিপাতি করে চেনে, সবার মনের অন্ধি-সন্ধি জানে, কোথাও কোনো ফাঁক ফোকরের ফিকির নেই। প্রত্যেকের বুকেই একটা করে পরিচ্ছন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস লাগানো, টেলিভিশন স্ক্রীন আঁটা, এবং কমপিউটারের সাহায্যে সেই স্ক্রীনে প্রত্যেকটি মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি ভাষায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। আমি আপনারটা পড়তে পারছি আপনি আমারটা। তাহলে কী হতো? কমপ্লিট্ কমিউনিকেশন হতো। নো গ্যাপ। সবাই সব কিছু জানতে পারতো। গোপন কথাটি রবে না গোপনে উঠিবে ফুটিয়া কমপিউটারের স্ক্রীনে। তারপর; তারপর এই দুনিয়াটা কেমন করে চলত? সভ্যতা লৌকিকতা যেমন চুলোয় যেত তেমনি চুলোয় যেত রাজনীতি কূটনীতি। সেই সঙ্গে লোপ পেতো জাল-জুচ্চুরি। গুপ্তপ্রেম, ঘুষভোজন, ব্যভিচার। আগে থেকেই যদি বুকের পর্দায় উদ্দেশ্য ফুটে ওঠে, সবার চোখের সামনে সবকিছু প্রকাশ হয়ে যায়—তাহলে অপরাধীদের জীবন তো দুর্বিষহ হতোই, নিরপরাধদেরও। বাঁচার জন্যে একটু আড়াল অত্যাবশ্যক, একটু গোপনীয়তা মনের স্বার্থের জন্যই বাঞ্ছনীয়। একটু প্রিভেসি।

কিন্তু আমাদের দেশে গোপনীয়তার গায়ে কুটিলতার পাপী-পাপী গন্ধ লেগে আছে, আর ন্যালা-খ্যাপা খোলামেলা স্বভাব মানেই সে সৎ, পুণ্যবান। এই বাল্য ধারণার জন্যই কিনা জানি না আমাদের সমাজে সরল লোকের সংখ্যাও বেশি। অনেকেই সত্যি সত্যি মনের কথা মুখ খুলে বলে ফ্যালেন। এই আপনি যেমন। আপনার মতন দুর্লভ

মানুষ আরো অনেক আছেন যাঁরা পরিণত বয়সেও শিশুর মতো সরল, ফুলের মতন নিষ্পাপ। আর শিশু এবং ফুলের মতই অন্য মানুষের মনের কথা তাঁরা বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করতে অক্ষম।

হ্যাঁ, আমি জানি এসব। জানি। কেননা এককালে আমিও যে আপনার মতন এমনি সহজ, সরল, দুগ্ধপোষ্য; অপাপবিদ্ধ ছিলুম। সারল্যে চলচল চোখমুখ নিয়ে অক্লেশে যাকে যা বলার নয় তাকে তাই বলে ফেলতুম, এবং বলেও বিন্দুমাত্র খেদ থাকতো না। থাকবে কী করে? কথাটা যে মন্দ বলেছি, তা তো আর আমি নিজে জানি না। সে জেনেছে অন্যে পরে। যারা শুনেছে। ফলে ক্রমশই আমি দেখছি আমার আর শত্রু নেই। আর বন্ধুও নেই। ফাঁকা মাঠ। একা খেলছি। কোনোদিকে কেউ কোথাও নেই। ধূ ধূ তেপান্তর। সব্বাইকে একধারসে যা যা বলবার নয় তাই বলে দিয়ে, সর্বত্র সকলকে হক্ কথা, খাঁটি বাত শুনিয়ে পগার পার করে দিয়ে এসেছি। এখন খাঁ খাঁ জীবনে আছে কেবল সত্য, সারল্য আর নিছক আমি।

এই বেলা যদি সাবধান না হন, হে সরল পাঠক, আপনারও কিন্তু এই পবিত্র অবস্থা হবে।

কবিরা বলেন—জগৎ বড় নিষ্ঠুর। কেননা আমি "হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুনিতে চাহে না কেহ"—তাই সবাই একা। কিন্তু ধরুন সব্বাই যদি আপনার "হৃদয়ের কথা শুনিতে ব্যাকুল" হতো—তাহলে কি আপনি বলতেন? তখন এই হতো, "বলিতে চাহে না কেহ।"

আসল কথা, সবারই কিছুটা খুলতে কিছুটা ঢাকতে হয়। বোরখা পরলেও সুবিধে হয় না, আবার ন্যূড কলোনিও সুবিধের নয়। ভাগ্যিস, সবার সব গোপন কথা নীরব নয়নে ফুটে ওঠে না, উঠলে কেলেঙ্কারি

হতো। যেমন কখনো কখনো হয়ে যায়।

আমি তো অনেকগুলো কেসই দেখলুম। সহজ-সরল-ঢাকাঢাকি-নেই টাইপের মানুষেরা মানুষ খুন করতে পারে। ফিজিক্যালি না হোক, ইমোশনালি তারা মার্ডার করতে পারে। করেও। আর ম্যানস্লটার তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় করে। অনবরতই করে। তাদের আবার সহজ সরল বলে সাত খুন মাপ।

আমি ব্যাপারটা জানি, কেননা আমি আগে আগে ঠিক ঐরকম ছিলুম। এখন ভাল হয়েছি। অর্থাৎ আর হোপলেসলি সরল নেই। এখন আমি দিব্যি ঘোরালো-প্যাঁচালো সভ্যভব্য। অর্থাৎ সাধারণ সমাজে বাসের যোগ্য। জটিল কুটিল হয়েছি, দিব্যি ঢেকে রেখে কথা বলি, কাউকে চটাই না (অর্থাৎ কাউকে "দুঃখ" দিই না), কারুকে অকারণে "দুটো ন্যায্য কথা শুনিয়ে" দিই না, কারুকে যেচে উপদেশ দিই না। কারুর উপকার করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ি না। এখন সবাই আমাকে ভাল লোক বলে। আগে বলত—"কী রুড, কী অসভ্য, কী বিশ্রী ক্যাঁটকেটে কথাবার্তা।"—এখন বলে "কী ভদ্র, কেমন সুন্দর মিষ্টি কথাবার্তা।" আগে বলত বড্ড বুনো মতন "জংলী", এখন বলে "কী সফিস্টিকেটেড"। এখন সরলটরল আর কেউ বলে না। না বলাই ভাল। বয়েস হলে বয়স্কই হওয়া ভাল। যে বয়সের যা। ছোট মুখে পাকা কথা যেমন বিচ্ছিরি; পাকা মুখে কচিকচি কথাও তেমনি বিচ্ছিরি।

কিন্তু নিজে জানলে তো, বুঝলে তো? স্বভাবসারল্য বড়ই মুশকিলের ব্যাপার, চট করে যেতে চায় না। এই যে, আমি যে বড় হয়েছি, তা কি আমি নিজে ছাই জানি, সে তো জানেন আপনারা। সারল্য ব্যাপারটা কেমন জানেন? এই কতকটা ছেলেবেলার অভ্যেসের

মতন। আমি যেমন এখনও ফুটপাতের ধারে ইটবাঁধানো সরু উঁচু বর্ডারটার কাছ দিয়ে হাঁটবার সময়ে, অন্যমনস্ক হয়ে গেলেই কখন ঠিক একপা একপা করে ইটের মাথায় মাথায় পা দিয়ে হেঁটে ফেলি। মেয়েরা কখনো কখনো খেয়াল করিয়ে দেয়—"মা! আবার"—যদি না তারা নিজেরাও ব্যস্ত থাকে ঐভাবে হাঁটতে।

বুকের স্ক্রীনে মনের কথা ফুটলে কেমন হতো?

ধরুন একদিন সকালে আপনি তখনো ঘুম থেকে ওঠেননি এমন সময় আপনার কাছে লোক এসেছে। আপনি উঠে বসবার ঘরে এলেন বটে ভদ্রতা করে অমনি বুকের পর্দায় কিন্তু প্রস্ফুটিত হলো—"কী জ্বালা! কেন যে এত সকালেই এরা চলে আসে?" কী লজ্জা; বলুন তো? অথবা, আপনি অফিসে গেছেন, প্রচণ্ড রোদ্দুরে মাথা গরম, এমন সময় বড় সাহেবের ঠাণ্ডা কামরায় ডাক পড়লো। আপনার যুগপৎ রাগ ও হিংসে হল। অমনি বুকের বোর্ডে যুক্তাক্ষরে লেখা ফুটল—'ওঃ! এই মূর্খটার কী কপাল! শ্বশুরের দৌলতে ঠাণ্ডা ঘরে বসে রোয়াব দেখাচ্ছে!' কোনো বন্ধুর বউকে দেখে আপনার দেহে মনে রিরংসার উদয় হলো। অমনি বুকের সাইনবোর্ডে লেখা ফুটলো—"রিরংসার উদয়!" অথবা আরেকজন বউয়ের ন্যাকামি দেখে আপনার ঘেন্না করল—অমনি বুকের বাক্স সবিনয়ে বলল, "কি ন্যাকা, কি ন্যাকা। লোকটা এই বউ নিয়ে ঘর করে কি করে?" ভাববেন না কেবল আপনার বাক্সই কথা বলছে, অন্যদের বাক্সও কিন্তু নোটিশ দিচ্ছে—এবং আপনি সেগুলো পড়ছেন। আপনাকে দেখে বড়-সাহেবের বুকের বাক্সে লেখা ফুটল—"এ ব্যাটা যেমন কুঁড়ে তেমনি অকর্মণ্য, নেহাৎ ওর দিদির সঙ্গে প্রেম করতাম—নইলে কবেই পশ্চাদ্দেশে পদাঘাতপূর্বক—"

ধরুন মিনিবাসে বাড়ি যাচ্ছেন, পাশের সিটের সহযাত্রিণীটি মৃদু হেসে একটু সরে বসলেন। তাঁর স্ক্রীন ওদিকে ঘোষণা করলো—"উঃ! এ লোকটার গায়ে কী বিটকেল গন্ধ রে বাবা!" একদিন আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেন, বড় মেয়ে চা করে এনে দিলে বটে, কিন্তু তার বুকের পর্দায় লেখা হলো—"এই রেঃ হয়ে গেল। আর পল্টুদার সঙ্গে বেরুনো হবে না আজকে।"

ট্রেনে যাচ্ছেন—বৌ-বাচ্চা নিয়ে। সামনের অতিভদ্র ভদ্রলোকের বুকের বাক্স বলল—"এই হতকুচ্ছিত লোকটার এমন সুন্দর বউ? যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা?" আর আপনার বউয়ের পর্দা বলল—"এই সুন্দর লোকটির সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হতো, আহা।" কিংবা—অনেকদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা হল—এক বন্ধুর বুকের বাক্স বলল—"মধু শালা এখনও মরেনি? দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ায়?" অন্য বন্ধুর বাক্স বলল—"মদুরে—কদ্দিন পরে তোকে দেখলুম। যাক, তুই প্রাণে বেঁচে আছিস তাহলে? ভগবানের দয়া।"

মোটকথা বুকের বোর্ডে মনের কথা ফুটে ওঠার ব্যাপারটা অত্যন্ত অসুবিধেজনক হতো, ভাগ্যিস সেটা ঘটে না! যেসব সরল মনের লোকেরা বুকে বোর্ড ছাড়াই মনের কথা মুখে প্রকাশ করে দেন, তাঁদেরও সমাজে চলতে ভয়ানক অসুবিধা হয়। তাঁদের সর্বক্ষণ একটা বৃহৎ ডিস্‌অ্যাডভানটেজে থাকতে হয় ভিস-আ-ভি অন্যান্য সামাজিক মানুষজন, যাঁরা নিজেদের মনের কথা মোটেই প্রকাশ করছেন না, কিন্তু সরল ব্যক্তিদের মনের খবর দিব্যি জেনে যাচ্ছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে উলটো বিপত্তি যে হয় না তা নয়। একবার আমার শ্বশুর-শাশুড়ি এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। ভদ্রমহিলা দরজা খুলেই বললেন, "এই সেরেছে! আবার দু' কাপ?"

তারপর ভীষণ লজ্জা পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন—"আসুন! আসুন! কদ্দিন পরে এলেন—কিছু যেন মনে করবেন না, আমার একটা মানসিক রোগ হয়েছে, মনের কথাটা মুখে বেরিয়ে পড়ে।—ঘরে চিনি বাড়ন্ত কিনা, তাই ওরকম বলে ফেলেছি!" আর মনে-টনে করবেন কি। এঁরা এখন পালাতে পারলে বাঁচেন।

এমনি সারল্যঘটিত দুর্ঘটনা আমাদের বাড়িতেই একবার হয়েছিল। সে আরও ভয়ানক কাণ্ড। তখন আমার বাবা সদ্য মারা গেছেন। মায়ের মন ভালো নয়, তাই অনেকে আসেন মার কাছে সঙ্গ দিতে। এক মহিলা রোজ বিকেলেই আসতেন, অনেকক্ষণ থাকতেন মার কাছে। তাঁকে আমি আগে খুব একটা দেখিনি অবশ্য কিন্তু ধরেই নিয়েছি নিশ্চয় মা-বাবার পুরোনো দিনের বন্ধু। আমি তো সবাইকে চিনি না। শ্রাদ্ধশান্তির পরে অন্যদের যাতায়াত কমলেও ইনি রোজই আসেন। মার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেন, ছেলের বউ, ঘর সংসার, দাস দাসী, বাজারদর সংক্রান্ত নানান গল্প। মা চুপচাপ শোনেন। মনটা তবু অন্যদিকে ব্যস্ত থাকে। একা হলেই তো কেবল প্রবল বিষাদে মগ্ন থাকেন। একদিন প্রতিবেশিনী যখন যাচ্ছেন, আমি সিঁড়ির মুখে এগিয়ে দিতে গিয়ে যথারীতি বললুম—"আবার আসবেন মাসিমা, আপনি এলে মার মন ভালো লাগে", এমন সময় ঘরের ভিতরে মা যেন কিছু বলে উঠলেন। স্বগতোক্তির মতো অস্পষ্ট স্বর হলেও বেশ বোঝা গেল কী বলছেন। মা বললেন—"মোটেও ভালো লাগে না, খুব বোরড্ লাগে—একটুও ভালো লাগে না আমার।" —ঘরে বাঘ ঢুকে পড়লেও হয়তো এতটা চম্‌কে উঠতেন না ভদ্র-মহিলা। প্রায় দৌড়ে নেমে গেলেন, কান্না চাপতে চাপতে। এক পায়ের চটি স্খলিত হয়ে তিনতলার সিঁড়ি থেকে একতলায় পড়ে

গেল। আমি লজ্জায় অধোবদন। ঘরে গিয়ে দেখি মা অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছেন।—"ওকি মা, ও তুমি কি কথা বললে? কেউ এলে বোরড্ হই, একটুও ভালো লাগে না—কি কাউকে বলতে আছে?" মা অবাক হয়ে বললেন—"কে বললে অমন কথা? আমি আবার কখন বললুম?"—"এইমাত্র বললে তো, মিসেস পালিতকে।" মা শুনে ভয়ে কাঁটা!—"এমা, তাই নাকি? ছি ছি ছি। কী মরণ রোগ হয়েছে আমার, বল্ দিকি? জেনে শুনে বলিনি রে। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে বোধহয়। দিনের পর দিন এত অত্যাচার তো আর সহ্য হয় না? কেবলই নিন্দে; বৌয়ের নিন্দে জায়ের নিন্দে ঝিয়ের নিন্দে ঠাকুরের নিন্দে—শুনতে শুনতে কি জানি—আমি বোধহয় পাগলই হয়ে গেছি!" মিসেস পালিত আর আসেননি—আমিও মনে করিনি সেটা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর।

তবে খাঁটি সত্য কথা মুখে বললে মাঝে মাঝে যে বুকে ছুরি বসাতে পারে—তার আর একটা প্রমাণ দিয়েই এই আড্ডা শেষ করছি। কবে বৌ সেজে বসে আছি। সেদিন আমার বৌভাত। বাগানে বেদী বাঁধা হয়েছে, গাছে গাছে রঙীন বাল্বের মেলা। কিন্তু বৌয়ের মুখ দেখবার জন্য লাইটিংয়ের বন্দোবস্ত নেই। এতে আমি খুবই খুশি। মুখটাও তো খুব একটা দেখাবার মতন নয়।—এমন সময় এক বৃদ্ধা মহিলা এলেন। হাতে লণ্ঠন। লণ্ঠনটির শিষ বাড়িয়ে দিয়ে মুখের কাছে তুলে ভালো করে দেখলেন। এ তো আজকালকার "ব্রাইডাল মেক-আপ" দেওয়া "ব্রাইড" নয়, এ সেই আগেকার কালের বৌ, পাড়ার বৌঝিরা যে যেমন পেরেছে ট্যালকম পাউডার আর চন্দন, জরির ফিতে আর সোনার কাঁটা, সিঁদুর আর আলতা দিয়ে সাজিয়েছে। এই বৃদ্ধা বিধবা খুবই সুন্দরী। লণ্ঠনটি আমার মুখের

কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, বেশ ভালো করে পরীক্ষা করে আপন মনে রায় দিলেন—"নাঃ—মন্দ না। তবে—রং তো দেখি কালো। নাক মুখও তেমন পরিষ্কার দেখি না। তা সে যাউক গিয়া, বউ এমন কিছু মন খারাপের মতো কুচ্ছিত না! বয়সডা তো অল্প আছে, বয়সের একটা আলগা শ্রী তো আছেই, হেইডা যদ্দিন থাকবো তদ্দিন তোমার চিন্তা নাই বৌমা।" এমন চমৎকার সান্ত্বনায় কোথায় পেখম মেলে নেচে উঠবো তা না, মনটা যে কী ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এই উইমেন্স ডেকেডে সেটা আর মুখ ফুটে বলে কাজ নেই!—"ভদ্রমহিলা মনে-মুখে এক"—একজন তরুণী ননদিনী সসম্ভ্রমে বাহবা মিশ্রিত গলায় ফিস্ ফিস্ করে আমায় জানালেন—"খুব সিম্পল, স্ট্রেটফরোয়ার্ড লোক কিন্তু। না? কে উনি, তা জানো তো? জান না? ওমা—উনিই তো ফিল্মস্টার সুনেত্রা সেনের মা—"!

ও হরি। তাই বলো। তবে এটা অ্যাবসলুট নয়। রেলেটিভ জাজমেণ্ট? যে স্বর্গীয় রূপ দেখতে তোমার চোখ অভ্যস্ত, তার সঙ্গে পাল্লা দেবো আমি? হায়! আমি কি হেলেন না পদ্মিনী? উর্বশী, না আর্টেমিস?

সরল সত্যটা হজম করতে কষ্ট হলো না আর।

নাম-ডাক

একটা কাক আমাকে বেজায় জ্বালাচ্ছিল সেদিন। পরীক্ষার খাতা দেখব কি? জানলার ওপরটিতে এসে দিব্যি গুছিয়ে বসে সে আমাকে এন্তার ডাকাডাকি করতে লাগলো: "—কাক? কাক? কাক! কাক!"

যত বলি, "—ওরে আমাকে দেখতে মানুষের মতো না-হলে কি হবে, কাকের মতোও মোটেই নয়, বরং কাকতাড়ুয়ার মতই অনেকটা—আমাকে তুই কাক বলে ভুল করলি কি বলে?" —ততই জেদ করে সে আমারই দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বেশ ঘনিষ্ঠ সুরে বাল্যবন্ধুর মতো আব্দেরে গলায় ডাকে—"কাক? কা—ক!"

এ তো মহা যন্ত্রণা হলো। তুই কাক, না আমি কাক? কাক তো তুমি নিজে। আমি তো মানুষ। আমাকে এমন কাক-কাক করে ডাকলে কি হবে। আমি মোটেই সাড়া দেব না। ডাকো না যত ইচ্ছে। আমি তা বলে কাক নই।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে সে একটানা নন্‌স্টপ ডাকতেই লাগলো—"কই কাক? কাক কই? কাক কই, কাক?"

আরে বাবা ওই তো কাক। ওইখানে। ওই যে আমার খড়-খড়ির ওপরে বসে গরাদের ফাঁকে নাক গলিয়ে, দক্ষিণে হাওয়ায় পুচ্ছ দুলিয়ে গলা ফুলিয়ে, গোল গোল চোখে গুলি পাকিয়ে যিনি

আমাকে আপ্রাণ হাঁকে ডাকে অস্থির করে তুলছেন, সেই ব্যক্তিই তো কাক। অর্থাৎ তুমিই কাক।

এত জানো, এও জানো না? যে-কাক খুঁজছো, সে-কাক আর কেউ নয়, তুমিই?

কাক আবার বলে—এবার বেশি অধৈর্য হয়ে নয়, বরং মিষ্টি করে বেশ ইন্টিমেট সুরে বলে—"কও, কাক? কাক কও কাক! কাক কও, কাক?"

—ও বাবা! এ কাক তো সোজা নয়। এ যে আমাকেই বুলি পড়াচ্ছে। বলছে—"কাক কও। কও কাক কাক"! এ যেন—'ময়না, কৃষ্ণ কও, কও কৃষ্ণ কৃষ্ণ।' ওরে কাক, তুই তো আচ্ছা পাখি?

শুনে রাখো, এত অহংকার ভালো নয়। নিজেই নিজের নামের বোল পড়ানো—এ চাল রাজনীতিতেও শেষ পর্যন্ত টেঁকে না। দেখলে তো, দেশে কী হলো?

এবার কাকটা লজ্জা পেয়ে গিয়ে বললো—"কক কক কক কোঁকর-র-র-কোঁ।" ও কি রে, ওকি? ওকি! বকুনি খেয়ে তুমি যে মাতৃভাষা ভুলে গেলে? ওটা কোন্ বুলি পড়ছো? ওটা কি তোমাদের রাষ্ট্রভাষা নাকি?

কাক আরো লজ্জা পেলো মনে হয়। এবারে গলা খুব নামিয়ে এনে ভেন্ট্রিলোকইস্টের মতো রহস্যপূর্ণ স্বরে—রীতিমতো কনফিডেনশিয়ালি বললো—'চিক্ চিক্ চিকির চিকির চিকির চিকির" ঠিক চড়াইপাখির ছানাতুতো গলায়। তারপরেই গলা চড়িয়ে হাঁকলো হুলোর হাঁক—"এ্যাঁয়াও, এ্যাঁয়াও"—এবং তৎপরক্ষণেই একটি কর্কশ আর্তনাদ—"ক্যা—"।

অর্থাৎ চড়াইপাখির ছানাদের হুলো-বেড়ালে খেয়ে ফেলল।

তারই টেপ রেকর্ডিং শুনিয়ে দিল সে আমাকে। নিজের গুণপনায় নিজেই গর্বিত হয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কাক চারিপাশটা একবার দেখে নিল—অডিয়েন্সটা মেপে নেবার মতন। তারপরেই ঘাড়টি খুব নরম করে হেলিয়ে, নুইয়ে এনে গদগদ আহ্লাদী গলা করে সন্তর্পণে আমাকে ডাকলো—

—কি গো? কি গো? কি গো? কাক। কাক? কই, কাক? কাক কও? কা—ক কও। কা—ক কও।"

অর্থাৎ কিনা, এতক্ষণ তোমার জন্যে সং সেজে কত ম্যাজিক দেখালুম, কত থিয়েটার করলুম, খুশি হয়েছো তো? এবারে ভালয় ভালয় নাম কর তো বাছা, নাম কর। কাক কাক বল তো সোনা, কাক কাক বল।

এ যেন কোনো কোনো ধর্মগুরুর সিদ্ধাই প্রদর্শন করে শিষ্যত্ব নেওয়ানোর মতন কায়দা।

আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার এই মহান নিষ্ঠা, নাম-মাহাত্ম্য প্রচারে রবার্ট ব্রুসের মতন তার এই অক্লান্ত প্রয়াস দেখে আমার মায়া হল। আমি এবারে দয়া করে গলা ছেড়ে ডেকে উঠলাম —"কা—ক! কা—ক! কই কাক? কাক কাক কও। কাক কাক কও।" শুনে সে বুঝি একটু অবাকই হয়ে গেল। একটি সুগোল চক্ষু আধখানা বুজে ফেলে ময়ূরকণ্ঠী ঘাড়টা বাঁদিকে কাত করে দুশ্চিন্তিত মুখে আমার দিকে দু' সেকেণ্ড চেয়ে রইল। ভাবখানা যেন—"নাঃ। হল না, হল না। এ তো কাক কাক নয়, মানুষ নিশ্চয়।"

তারপরেই তার ধূপছায়া বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাসের মতন বাতাস এল, তাইতে ডানা মেলে দিয়ে সে দুপুর বেলার রোদ্দুরের ভেতরে উড়ে গেল—ইস্পাতের আকাশের দিকে ছোঁড়া একটা তীরের

মতন। —"কাক? কাক? কই কাক? কাক কই?" ডাকতে ডাকতে।

সারাদিন ধরে, সারাজীবন ধরে ও এখন কাককেই খুঁজে ফিরবে। যে-কাক ওর ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে নিজের মধ্যে থেকে সেই গভীর গোপন লুকোনো কাককে ডাক দিয়ে ফিরবে সে। অত্যন্ত খোঁজাখুঁজি অবিশ্রান্ত ডাকাডাকি চলবে, আপনাকে এই চেনা তাহার ফুরাবে না। নিজের দোরে নিজেকে ডেকে বেড়ানো নিজেকে খুঁজে বেড়ানো, নিজের নামটাই নিজেকে বুলি পড়ানো, এই তার জীবধর্ম। "কাক—কাক কও।" স্বনাম সাধাই ওর জপ তপ।

কিন্তু আমি? আমি কি কখনো এমন করে নিজেকে খুঁজে বেড়াতে পারবো?—

—"মানুষ! মানুষ কই মানুষ? মানুষ কই?" নিজের নামটি কি নিজেকে বুলি পড়াতে পারবো—"মানুষ, মানুষ কও। মানুষ কও, মানুষ!"

নিজের নামটা কি আমার মনে পড়ে?

ছুটি

মানুষ একজীবনে অনেক জীবন কাটায়।

সে ছিলো একরকম ছেলেবেলায়। এক একটা ছুটির এক একরকম স্বাদ গন্ধ। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমপোড়া শরবতের স্বাদ—খস্‌খস্‌-এর পর্দায় জল-ছিটোনোর সুগন্ধ। মেঝেয় মাদুর পেতে, ঘর অন্ধকার করে পাখা খুলে আমাকে আঁচলচাপা দিয়ে শুইয়ে মা ঘুমিয়ে পড়তেন। আমি পালাতুম বারান্দায়, জয়ন্ত-মানিকের রাজ্যে। ঝনঝনে রোদে ম্যাগ্নোলিয়ার লুব্ধ প্রতিধ্বনি উঠতো রাস্তায়, ঘুল-ঘুলিতে শালিকছানার কিচিমিচির। তবুও দুপুরগুলো ছিলো অন্তহীন। শেষদিকে তো ইস্কুলের থামগুলোর জন্যেও মনকেমন করতো। পুজোর ছুটি কিন্তু অন্যরকম। ঝট্‌ করে ফুরিয়ে যেতো। বাড়িতে তখন ঘন ঘন তাঁতি-দর্জির আনাগোনা, নতুন জুতোর মাপ দিতে যাও, কালী পুজোর বাজী কিনতে যাও, ঠাকুর গুনে বেড়াও, বিজয়ার মিষ্টি খেয়ে বেড়াও, কাজ কি কম? পুজোর ছুটিতে শলমা-চুমকির কাজ ছিলো। আর বড়োদিনের ছুটির গায়ে সাহেবী পোষাক। তার নিঃশ্বাসে ফারপোর প্লামকেকের গন্ধ। বড়দিনের ছুটি চিড়িয়াখানার খুশির বাতাসে ভাসতো, পিক্‌নিক পার্টির মিঠে রোদে ঝলমলাতো। আর প্রত্যেক ছুটিতেই বেড়াতে যাওয়া—ছুটি মানেই কু-ঝিক্‌ঝিক্‌, চা গ্রাম্‌ম! পান-ব্রি-সিগ্রেট! ছুটি মানেই নতুন দেশ।

বিদেশে পড়তে গিয়ে আরেক জাতের ছুটি চিনলুম। তার নাম

'সপ্তাহান্ত-যাপন'। ছুটি তো নয়, ছুটোছুটি। পাঁচদিনের দুরন্ত শ্রমের পরে দুটোদিন দুরন্ত বিশ্রাম। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া অন্য কোথা অন্য কোনোখানে। ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং তাঁবুতে মোটেলে। সে এক অস্থির ছুটি অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে। সে দেশে সকলেই যেন স্বগৃহে প্রবাসী।

সংসার জীবনে এসে আবিষ্কার করলুম গৃহিণীদের অভিধানে ছুটি বলে কোনো শব্দ নেই। রবিবার বলে তো হাঁড়ি-হেঁশেল শিকেয় উঠবে না, বরং কাজ বাড়ে। ছেলেবেলার রবিবার সেই মর্নিং শো'য়ের লরেল-হার্ডি আর বাড়ি বাড়ি মাংস রান্নার সুবাস নিয়ে কবেই হারিয়ে গিয়েছে। এখনকার রবিবারটা সুবিধের নয়। মেয়েদের ছুটি আর বাবাটির ছুটি একসঙ্গে হলে, মায়ের অবস্থা শোচনীয়। সপ্তাহে একটি দিনে প্রিয়জনেরা কাছে আছে, প্রাণটা কোথায় জুড়িয়ে যাবে, তা নয়, প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত। এটা কৈ, সেটা কৈ, চা বানাও, কফি করো, —মা দিদি আমাকে মারলো,—না মা, টুম্পাই আগে মেরেছে··· হে ভগবান, জগতে এত স্ট্রাইক, এত লক্ আউট হয়—গিন্নিদের কেন কর্মবিরতি ঘোষণার অধিকার নেই? অতিথি নারায়ণদের লক আউট করা কেন যায় না? বললে খারাপ শোনায়, কিন্তু আপিস-ইস্কুল খোলা থাকলেই বরং গিন্নির একটু ছুটি মেলে, দুপুরটায় টুকিটাকি সেলাই, এটা-ওটা রান্না, কি দু'পাতা গল্পের বই ওল্টানোর ফুরসৎ থাকে। ছুটির দিনে? ও বাবা—

কালচক্র ঘুরে গেছে, কখন যেন কত্তা-গিন্নির দ্বৈত ভূমিকায় নেমে পড়েছি। এখন হপ্তা কাটে শনি রবির পথ চেয়ে। শুক্রবার বিকেল হলেই উড়ে যেতে ইচ্ছে করে। কাল মেয়েদের ইস্কুল নেই, ভোরে ওঠার তাড়া নেই। আমারও অফ্ ডে, পড়া তৈরি করা নেই। আহা,

শুক্রবার সন্ধ্যা, আবির্ভাবে শান্তি দিলে, চন্দন চন্দন !

ছুটি মানেই জমে থাকা কাজ উদ্ধার ! চিঠির জবাব, বোতাম সেলাই, খাতা দেখা, রীঠে ভিজিয়ে গরম জামাগুলো কেচে ফেলা, প্রবন্ধটা টাইপিং শেষ করা, একটা শাড়ি পাচ্ছি না, আলমারির সব নামিয়ে খুঁজতে হবে, গাড়ির সাইলেন্সর পাইপ বদলানো দরকার, কলটার ওয়াশার—মেয়ের রক্তপরীক্ষা···আজ থাক। এখনো দু'দিন ছুটি আছে। আজ তো একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়ি।···আ-হ্ ।

শনিবার সকালে চায়ের কাপটি এগিয়ে দিয়েই রাঁধুনী বললেন : —'দিদি, আজ তো আপনার ছুটি আছে, গ্যাসের অপিসে একবার যদি'— / গাড়ি ধোয় যে ছেলেটি, সে : 'দিদি, আজই গাড়িটা কারখানায় নিয়ে যান, ছুটি আছে' / বড়মেয়ে বলে : 'মা, মনে আছে তো, আজ চ্যাপলিনের ছবিটা দেখাবে বলেছিলে' / ছোটো : 'মা, আজ তো ছুটির দিন, চিড়িয়াখানায় নিয়ে চলো না' / মা বলেন : 'ওরে, আজ তো তোর ছুটি, আমাকে একবার ঠনঠনেতে নিয়ে যাবি ?' / ওপরে ফোন বাজলো : 'লেখাটা রেডি তো, আমরা দশটা নাগাদ আসছি' / নিচে বেল বাজলো : 'দিদি, বেলেঘাটা থেকে কন্ট্রাক্টরবাবু' / ফোন : 'সন্ধ্যেটা ফ্রী রাখিস, আজই নির্মলের ফেয়ারওয়েল' / বেল : 'দিদি, আপনার এক ছাত্তর এয়েছেন', ফোন বেল ক্রীং টিং ক্রীং···

রবিবার রাত্রি। রীঠে ভেপসে উঠেছে। কাচা হয়নি। রাঁধুনীর মুখচন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে, নির্গ্যাস গৃহ। মেয়েদের ঠোঁটে দুঃখু, মায়ের চোখে অভিমান, চিঠিপত্র না-জবাব, প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ, খাতা অনবহিত, গাড়ি সশব্দ, কল অনিরুদ্ধ। কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর। ছুটির ধাক্কায় ক্লান্তি ভেঙে পড়ছে। তাই বলে এখুনি

শুতে যাওয়া হবে না। কালকের বক্তৃতার প্রস্তুতি চাই, স্কুল য়ুনিফর্মগুলো ইস্ত্রি করা চাই···এখনও বহু কাজ।

এসব তো গেল নকল ছুটি। আসল ছুটির ডাক যেদিন আসবে, সেদিন কি আমি 'সবারে আমি প্রণাম করে যাই' বলবার সময় পাবো? শেষ ছুটিটার তারিখ যে ক্যালেণ্ডারে ছাপা থাকে না। ক্যালেণ্ডারে নেই, এমন ছুটি অবশ্য আরো আছে। এক কবি তাঁর প্রিয়াকে আড়ালে ডাকতেন, 'ভাই ছুটি!' এরকম গোপন ছুটি আপনার-আমারও কি নেই? ধরুন-না তার কথাই, যার একপলকের চোখের চাওয়া আপনাকে ঘরভর্তি কর্মব্যস্ততা থেকে ছিনিয়ে নেবে, একনিমেষেই দাঁড় করিয়ে দেবে খোলা হাওয়ায়, নদীর ধারে। কখনো বা কাজে যাবার পথে ভেসে আসা এককলি গান দিনভোর আপনার রক্তের মধ্যে ছুটির ঘণ্টা বাজায়। বাজায় না? এ হলো ভেতরের ছুটি। জীবনের বানভাসি খাদের গভীরে এই ছুটিগুলোই আমাদের এয়ারপকেট। অক্ষয়, অব্যয়।

—